সমুদ্রের ডাক

আহসান হাবীব

ভূমিকা

এই বইয়ের ভালোমন্দের দায়দায়িত্ব *অন্যদিন*-এর সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের। তিনি আমাকে বাধ্য করিয়েছেন তার অন্যদিন ঈদ সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখতে। 'অফিসিয়ালী' এটি আমার প্রথম উপন্যাস (আনঅফিসিয়ালী আমার আরেকটি উপন্যাস বেরিয়েছিল। সেটিকে আমি নিজেই কালের গর্ভে বিলীন হতে দিয়েছি।) ঈদ সংখ্যার উপন্যাসটির নাম ছিল 'কায়া ছায়া'। কিন্তু গ্রন্থাকারে বের হওয়ার সময় নাম পরিবর্তন করলাম *অন্যদিন*-এর নির্বাহী সম্পাদক আবদুল্লাহ নাসেরের অনুরোধে। লেখাটি গ্রন্থাকারে বের করতে গিয়ে অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে, বড় করতে হয়েছে... এই আর কি! সবাইকে শুভেচ্ছা।

আহসান হাবীব
পল্লবী, ঢাকা।

ক'দিন ধরেই কোনো কারণ ছাড়াই কেন যেন মাছ খাওয়ার বড্ড শখ হয়েছে মহিমের। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। শেষ কবে মাছ খেয়েছিল মহিম ? তার এই দশ বছরের জীবনে সে ঠিক মনে করতে পারে না। তবে কি সে মাছ খায় নাই কখনো ?

মা, আমি কি মাছ খাইছিলাম কুনোদিন ?

মা মরিয়ম হেসে ফেলে। কষ্টও লাগে একটু। আহা ছেলেটার মাছ খাওয়ার শখ, কিন্তু উপায় নাই। নদী ভাঙনের পর তারা এই গ্রামে উঠে এসেছে। তাও বছরখানেক হলো। তারপর থেকেই মরিয়মের সংসারে দুর্দিন চলছে, সময়মতো রান্নাই উঠে না চুলায়। সেখানে মাছ আসবে কোত্থেকে! সে ছেলেকে তাড়া দেয়, যা যা দেখ লাকড়ি মাকড়ি পাস কিনা দেখ।

মা, আইজকা কী রানবা ?

সেইটা এক আল্লাহপাক জানে, আগে তো লাকড়ি টুকায়া আন।

ঘরে তেল আছে মা ?

ক্যান তেল দিয়ে কী হইব ?

মাছভাজা খাইতে মন চায়।

আরে হারামজাদা, মাছ পাইবি কই ?

যদি পাই!

ওরে আমার মাছওলারে... যা ভাগ!

মহিম বেরিয়ে পড়ে লাকড়ির সন্ধানে। লাকড়ি না পেলে চুলায় ভাত নাও উঠতে পারে। ক্ষিধা সহ্য হয় না মহিমের। একবার ভাবল বড়বোনটাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে নেয়। কী ভেবে একাই রওনা হলো।

গ্রামের শেষপ্রান্তে হাওর। হাওরের দিকে যেতে হলে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। কী ভেবে মহিম সে-পথেই রওনা হলো। পথে মহিম বটতলায় থমকে দাঁড়াল। নামেই বটতলা। এখন সেই গাছ নেই, তার কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে আছে। এই কঙ্কালের নিচেই ক'দিন আগে একটা সভা হয়েছিল। শহর থেকে কারা সব এসেছিল। ভালো ভালো কথা বলেছে তারা। সব বুঝে নি, তবে তার বড় বোন

ময়না বুঝেছে। বাংলাদেশ নাকি একটি ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপ একদিন ডুবে যাবে...

তখন আমরা কই যামু ?

মহিম প্রশ্ন করেছিল তার সেভেনে পড়ুয়া বড়বোনকে, যে দাবি করেছিল এই মিটিংয়ের সব কথাবার্তা সে বুঝতে পেরেছে।

তখন আমরা বিদেশে যামু গা।

বিদেশটা কোন দেশে ?

আরে গাধা, বিদেশও একটা দেশ। অন্য দেশ।

তখন কি আমরা বড়লোক হমু ?

হইতেও পারি। সেইটা হইব অন্য দেশ, বড়লোকগো দেশ।

তাইলে সেই দেশে এখন যাই না ক্যান ?

এর উত্তর অবশ্য মহিমের বিজ্ঞ বোন দেয় নি। মুখে আঙুল দিয়ে শ শ শ করে বলেছে, কী কয় শোন...।

লোকটা তখন বলছিল, ... 'পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এর জন্য আমরা দায়ী নই। পশ্চিমাদের খেয়ালখুশির শিকার আমরা। কার্বন গ্যাসের কারণে উত্তপ্ত পৃথিবীর সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠছে, যেমনটা কেতলির পানি উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে। উত্তরমেরুর গ্লেসিয়ার গলছে... সমুদ্রতলের ভূকম্পন...।' লোকটা একগ্লাস পানি খায়। তারপর ফের মেশিনের মতো বলতে শুরু করে, 'এখনই সময় আমাদের সচেতন হওয়ার। আমাদের দেশ পলিবাহিত দেশ, সঠিক সংস্কারের মাধ্যমে পলি দিয়ে নিম্নভূমির উচ্চতা বাড়াতে হবে। হাইড্রো জিওলজির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়...।'

মহিম আর দাঁড়ায় নি। তার জ্ঞানী বোনকে পেছনে রেখে ছুটে গিয়েছিল হাওরের পথে। পথ তো নয় যেন ধুলামাখা একটা সাপ এঁকেবেঁকে পড়ে আছে।

সেই একই পথে আজ আবার ছুটছে। সে ভালো করেই জানে এই পথে শুকনো লাকড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাহলে কেন যাচ্ছে ? হাওড়ের দক্ষিণ দিকে ওয়াজিউল্লাহদের মাছের ঘের। সেখানে মাছ চাষ হয়। বড় বড় সব মাছ। একটা মাছ চুরি করলে কেমন হয় ? মাত্র একটা মাছ। কেউ জানবে না। মহিমের বড়বোন বলে, চুরি করা মহাপাপ। সে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু মহিমের কী হলো, সে ঠিক করেছে আজ একটা মাছ তবুও চুরি করবে।

তাদের গ্রামে একবার একটা চোর ধরা পড়েছিল। মহিমের মনে আছে, মাছ চোর না। দিনে দুপুরে আস্ত একটা গরু হাপিস করার তালে ছিল চোরটা। ধরা পড়ে বেদম মার খেল। তারপর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠে গোঁ গোঁ করে মরেই গেল,

বেচারা চোর! থানা-পুলিশ কত কাহিনী। যারা চোরকে মেরেছিল তারা বহুদিন গ্রাম ছাড়া ছিল। মাঝখান দিয়ে চোরাই গরুটা চোরের বউকেই দেয়া হয়েছিল। আচ্ছা মহিম যদি ধরা পড়ে যায়।

ওকেও কি সবাই ঐ চোরটার মতো মারবে ? মহিমের ছোট্ট বুকটা অজানা আশঙ্কায় ধ্বক করে উঠে।

স্যার, মহিমকে মনে আছে ?

মহিম কে ?

একটা বাচ্চাছেলে। বয়স কত হবে, দশ বারো!

মনে নাই।

চেষ্টা করেন স্যার, মনে পড়বে।

মহিম... মহিম...

হ্যাঁ মহিম। তার একদিন শখ হলো মাছ খাবে। আপনার ঘেরে মাছ চুরি করতে গেল। সময়টা খুব ভোর। ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে।

তারপর...?

তারপর স্যার আপনি তাকে গুলি করলেন।

গুলি করলাম ?

হ্যাঁ, আপনার নতুন কেনা টু টু বোরের রাইফেল। একটা টার্গেট প্র্যাকটিস করা দরকার ছিল, তাই করলেন। ওটা আসলে ছিল পাখি শিকারের রাইফেল। তবে মহিম কিন্তু ঐ গুলিতেই মরল।

... মনে পড়েছে, আমার সঙ্গে কুদ্দুস ছিল।

হ্যাঁ আপনার ডানহাত। আপনার প্রথম জীবনের সব দুষ্কর্মের সহযোগী।

হাসপাতালের বিছানায় শোয়া ওয়াজিউল্লাহকে চিন্তিত মনে হয়। তার কপাল কুঁচকে আসে। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করেন তিনি। যেন স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানো কোনো বালখিল্য তরুণ!

কুদ্দুস, কারে মারলাম রে ?

যারেই মারেন হে অপ্রাধী। আপনার ঘেরে মাছ চুরি করতে ঢুকছিল।

প্রথম খুন করলামরে কুদ্দুস।

অসুবিধা নাই, আরো করতে হইব... দরকার আছে... খারান আমি আইতাছি।

কুদ্দুস পানি ভেঙে একটা লম্বা লগি নিয়ে ঘেরের ভেতর নেমে পড়ে। ভোরের কুয়াশায় কিছু বোঝা যায় না। দূর থেকে ওয়াজিউল্লাহ বুঝতে পারেন কোমর পানিতে নেমে গেছে কুদ্দুস। কুদ্দুস সময় নিয়ে কিছু একটা করে। জলের শব্দ শুনতে পান ওয়াজিউল্লাহ। কিছুক্ষণ বাদেই কুদ্দুস উঠে আসে।

কী করলিরে কুদ্দুস ?

লাশটা ঠেলা দিয়া ঘেরের বাইরে পাঠাইয়া দিলাম। লক্ষিন্দরের মতো ভাসতে ভাসতে যেইখানে যায় যাউক।

লাশটা কার রে ?

বাদ দেন।

ক না কার ?

মহিম।

মহিম ? মহিম কেডা ?

আপনে চিনবেন না। উত্তরপাড়ার ...

কে ? মরিয়ম বিধবার ছেলেটা ?

জি মহিম। বিরাট বদ। চুরির উপরই আছে।

স্যার, মনে পড়ছে ?

পড়ছে। ওয়াজিউল্লাহর চোখ যেন কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়। তিনি এখন পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারছেন।

একটা বাচ্চাছেলেকে গুলি করে মেরে আপনার শুরু।

কিন্তু ডাক্তার তুমি জানলে কীভাবে ?

মহিমের লাশটা ভাসতে ভাসতে গিয়া একটা দ্বীপে ঠেকছিল।

দ্বীপ ? হাকুরী হাওরে দ্বীপ পাইলা কই ?

ঐ আর কি, ছোট্ট একটা চরের মতো। গাছপালা আর একটা ছাপড়া ঘর। কেউ কেউ ছাপড়ার দ্বীপও বলত।

বুঝতে পারছি, মনে পড়ছে। ছবির মতো সব মনে পড়ছে। ঐখানে একটা ভণ্ড সাধু থাকত ?

পৃথিবীর সব সাধুই কারো না কারো কাছে ভণ্ড।

ওদিকে হাকুরী দ্বীপের চারপাশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। চারিদিকে নিশ্চুপ, কান পাতলে হাওরের জলের কল্লোল ধ্বনি কানে আসে, শান্ত ছোট ছোট ঢেউগুলো

ফিসফিস করে কথা বলে... ফিসফিস করে কথা বলে আরেকজন, তিনি হাকুরী দ্বীপের স্বঘোষিত সাধু...

আজমল, একটা বাচ্চাছেলে আসছে।

কই ?

চরের নামার দিকে যাও।

ক্যামনে আসল ? কার নৌকায় ?

সে এমনিই আসছে। ... সে মাছ খাইতে চাইছিল... এখন সে নিজেই মাছের খাদ্য।

এইসব কী বলতেছেন কিছু বুঝতাছি না।

তারে মাছের খাদ্য হইতে দিও না। তমিজের সাথে তারে এইখানে দাফন দেও।

হাকুরী দ্বীপের সাধু বাবা বয়সে খুব বেশি বড় হবে না, তবে তাকে বয়স্ক দেখায়। তারা সাদা দাড়ি আর বাবড়ি চুলে এই সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে তাকে অন্যরকম লাগে।

তরুণ ছেলেটি মুহূর্তে ছুটে আসে। সাধু বাবা, ক্যামনে বুঝলেন ঐ ছেলেটা আসছে ?

বুঝা যায়। বাতাস ইশারা দেয়রে বোকা, বাতাস ইশারা দেয়।

কিন্তু আপনি তো ...। তরুণ আরো কিছু বলতে চায়। সাধুর হাতের ভঙ্গিতে থেমে যায়। যার অর্থ, তোমাকে যা করতে বলেছি কর। ছেলেটিকে তমিজের সাথে দাফন কর।

তরুণ একটা কোদাল নিয়ে দ্রুত গর্ত করতে শুরু করে। নরম মাটি, দ্রুত গর্ত তৈরি হয়ে যায়। তবে গর্তে পানি উঠছে। ছেলেটাকে গর্তে নামানো দরকার। কাজটা সে একাই করে।

বিছানায় ওয়াজিউল্লাহ নড়েচড়ে উঠার চেষ্টা করেন, পারেন না। ফিসফিস করে বলেন, ডাক্তার সব মনে পড়ছে। পরিষ্কার ছবির মতো। তুমি কীভাবে এইটা করলা ? কী ওষুধ দিছ ?

কোনো ওষুধ দেই নাই। একটা থেরাপি চলছে, তাতেই কাজ হইছে। আপনি বলেন... বলতে থাকেন।

ঐ ভণ্ডরে আমি মারতে গেছিলাম।

কী কইরা বুঝলেন সে ভণ্ড ?

সে ঐখানে একলা কী করে ? সে আসলে ছিল সোনা চোরাচালান রুটের একটা স্টেশন ম্যানেজারের মতো। আমি জানি।

আপনার সোনাচোরা চালানে সে রাজি হয় নাই ?

ডাক্তার, তুমি বেশি কথা কও। সুস্থ থাকলে তোমার জিভ টান দিয়া ছিঁইড়া ফেলাইতাম।

ডাক্তার গিয়াস শব্দ করে হাসে। বদ্ধ কেবিনে শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়। ওয়াজিউল্লাহ্ আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, একজন নার্স কিংবা অন্যকেউ আসে না কেন ?

আপনি সাধুরে মারতে পারছিলেন ?

উমমমম...। ওয়াজিউল্লাহ্ চোখ বুজেন।

ছোট্ট নৌকাটা সর সর করে জল কেটে এগুচ্ছে। হাওরের জল শব্দ করে ধাক্কা দিচ্ছে পাটাতনে। কুদ্দুস শক্ত হাতে বৈঠা মারছে। তার শক্ত হাতের পেশিগুলো কিলবিল করে উঠছে বৈঠার প্রতি টানে।

কুদ্দুস ঠিক তো, ঐ সাধু সব জানে ?

জি। আমি খবর পাইছি, মহিমের লাশ সে দাফন দিছে।

কোথায় ?

সেইটা জানি না।

তাইলে তো ওরে আর রাখা যায় না।

জি-না।

আর কতদূর ?

এই তো আইসা গেছি। ঐ যে ঝাঁকড়া গাছগুলা দেখা যাইতাছে। ঐটাই ঐ সাধুর চর। একটা ছাপড়ার মতো বানায়া থাকে। কেউ কেউ ছাপড়ারচরও বলে। কেউ কেউ বলে হাকুরী হাওরের দ্বীপ।

ঘরবাড়ি কিছু আছে ?

না একটা চকির উপরে থাকে। চকিটা দড়ি দিয়া বান্দা থাকে কড়ই গাছের সঙ্গে। ঐখানে অনেক কড়ই গাছ।

জোয়ারের সময় কী হয় ?

ওর চকির চাইর পায়া ডুইবা যায়

চকি ভাইসা যায় না ?

না...

নৌকাটা নিঃশব্দে থামে। ওয়াজিউল্লাহ নামে। হাতে টু টু বোরের রাইফেল নয়, ছোট্ট একটা লুগ্যার পিস্তল। কুদ্দুস নৌকায় বসে থাকে। একাগ্রচিত্তে একটা পরিচিত শব্দের জন্য অপেক্ষা করে। শব্দটা তার প্রিয়।

টাস্‌স্‌স্‌!... শব্দের কারণেই কিনা কে জানে, ছাপড়ার চরের ঝাঁকড়া গাছগুলো থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায় অদ্ভুত শব্দ করে! কী পাখি এগুলো ?

উড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় পানকৌড়ি। কুদ্দুস পাখি ভালো চিনে। জলের পাখি পানকৌড়ি এই সময় গাছে বাসা বাঁধে। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে এরা বাসা বাঁধে। এখন ভাদ্র মাসের শেষ, এই সময় এরা পালা করে ডিমে তা দেয়। দূর থেকে এদের কাকের মতো দেখায় বলে কেউ কেউ জলকাকও বলে।

ঐ হারামজাদা কী দেখস ?

জলকাক।

জলকাক দেখার কী আছে ?

ওর গলার কাছে কী সুন্দর সাদা, এইজন্য কাকের মতো দেখায়।

জলকাক পরে দেখিস, নৌকা ছাড়।

কুদ্দুস অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বৈঠা দিয়ে ঠেলা দেয়। নৌকাটা পাক খেয়ে গভীর পানিতে এসে দাঁড়ায়।

সাধুরে কী করছেন ?

কিছু করি নাই ঐখানেই আছে।

কী কন ? প্রমাণ রাইখা আসলেন ?

আরে বেয়াকুফ ওর চকির দড়িটা কাইটা দিয়া আসছি।

তাইলে ঠিক আছে। জোয়ারে ভাসায়া নিয়া যাইব... মহিমের পরে এ হইল আরেক লক্ষিন্দর...

স্যার, আপনি যখন ঐ সাধুকে মারেন তখন সে কিছু বলছিল ?

ডাঃ গিয়াসের প্রশ্নে চোখ খোলে ওয়াজিউল্লাহ। কথা বলতে ইচ্ছা করে না, তারপরও বিড় বিড় করে বলেন, তারে বলার সুযোগ দেই নাই। তবে ...

তবে ?

তবে সে একটা বাঁশের মাচায় বইসা ছিল। তারে বলছিলাম উইঠা দাঁড়াইতে।

দাঁড়াইছিল ?

না, সে দাঁড়ায় নাই। আমাকে দেখলে সবাই উইঠা দাঁড়ায়, সে দাঁড়ায় নাই।

তাতেই আপনার রাগ উঠল ?

রাগ উঠার দরকার ছিল। একটু অজুহাত তো দরকার।

আপনি তাকে দাঁড়াতে বললেন আর সে দাঁড়াল না। তারপর কী করলেন? এমনি এমনি মানুষ মারা যায়?

আচ্ছা ডাক্তার, আমাকে এত প্রশ্ন করতাছ কেন? এসব জাইনা তোমার কী লাভ?

কোনো লাভ নাই। আমি আসলে হিসাব মিলাইতেছি। বলেন ...

কী বলব?

সাধুকে দাঁড়াইতে বললেন, সাধু দাঁড়াইল না। তারপর আপনি কী করলেন? গুলি করলেন?

সে দাঁড়াইল না, তবে সে একটা হাসি দিছিল।

হাসল?

হ্যাঁ হাসল। তার হাসিটা সুন্দর।

সে কেন উইঠা দাঁড়ায় নাই জানেন?

কেন?

ঐ সাধুর পা ছিল না।

তাই নাকি? এইডা জানতাম না। যখন গুলি করি তখনো বুঝি নাই। কিন্তু তুমি তো বললা না তুমি এই ঘটনা জানলা কীভাবে? আমি তো কোনো প্রমাণ রাখি নাই। আমি প্রমাণ রাইখা কাজ করি না।

আমাকে একজন বলছে।

কে বলছে?

যে বলছে তারেও আপনি মারছেন।

বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছেন?

তুমি আজমলের কথা বলতাছ?

হতে পারে, তার নামটা আমার মনে নাই।

কিন্তু আমি এই যে কথা বলতেছি তোমার সাথে, এইটা কীভাবে হইল? একটু আগেও তো কথা বলতে পারতেছিলাম না।

স্যার, এখন বিশ্বাস হইল তো খেলাটা এখন আমার হাতে। এখনই আবার আপনাকে আগের মতো কোমায় নিয়া যাব। আবার কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।

ডাক্তার গিয়াস ঘ্যাচ করে একটা সিরিঞ্জের সুই ঢুকিয়ে দেয় মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর হাতে। মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ কেঁপে উঠেন। আর তখনই হুড়মুড়

করে ঢোকে দুজন। অন্তত ডাঃ গিয়াসের তাই মনে হয়। দুজন সিনিয়র প্রফেসর। কিন্তু এই সময় তো উনাদের রাউন্ডে আসার কথা না।

হ্যালো ডাক্তার গিয়াস, তোমার রোগীর অবস্থা কী ?

আগের চেয়ে ভালো স্যার।

হুঁ, আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। কী বলেন ডাঃ জোহা ?

হুম! কিন্তু তোমার হাতে ওটা কী ?

স্যার...

দেখি আমার হাতে দাও। ডাঃ জোহা এগিয়ে আসেন।

খুব সামান্য একটা ঘটনা। তারপরও বুকটা কেমন করে উঠে সেলিনার। সে চেঁচিয়ে ওঠে, বুড়ামিয়া, রিকশা রাখেন। রিকশা থেমে যায়। সেলিনা তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে নেমে আসে। রাস্তাটা এখানে নিরিবিলি। বাঁ-পাশে একসারি ঝাউগাছ। স্থানীয় নাম পবন ঝাউ। এখানে ঝাউগাছ থাকার কথা না। সরকারের বনবিভাগের একটা পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট। নইলে একসঙ্গে এত ঝাউগাছ এখানে কেন আসবে! বাতাসে সরসর শব্দ করছে ঝাউগাছগুলো, শুনতে ভালো লাগে। ঝাউগাছের আরেক পাশেই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত।

যখন প্রবল বাতাস উঠে তখন ঝাউগাছ আর পাশের ধানক্ষেত থেকেও একটা মিলিত মিশ্র শব্দ ভেসে আসে... মনে হয় দূরাগত কোনো সমুদ্রের ডাক। যেন সমুদ্র ডাকছে। তবে এই এলাকার লোকজন সমুদ্র তো দূরে নদীই দেখে নি!

তবে ঝাউবন ও ধানক্ষেতগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া গ্রামের এই রাস্তাটা কত বছর ধরে একইরকম আছে। সেলিনা ঝাউবনের ভেতর ঢুকে পড়ে। বুড়ো রিকশাওয়ালা একটা বিড়ি ধরায়। সে সেলিনাকে ভালো করে চেনে, এই গ্রামেরই মেয়ে। শহরে থাকে। মাঝে মধ্যে গ্রামে বেড়াতে আসে। জামাই উকিল। ভালো উকিল, আয় রোজগার ভালো। তবে মেয়েটার কি আজমলের সঙ্গে ভালোবাসা ছিল বিয়ের আগে ? কে জানে! এই ঝাউবনে আজমলের সঙ্গে একবার দেখেছিল সে, সেও কত বছর আগে। এ নিয়ে গ্রামে বেশ কথাও উঠেছিল সে সময়। তবে সে আদার ব্যাপারি, তার জাহাজের খবরের কী দরকার!

সেলিনা দ্রুত হেঁটে এসে দাঁড়ায় সেই গাছটার নিচে। লোকটা এখানে তার হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, ঠিক এই গাছটার নিচে, সেলিনা, তোমারে ভালোবাসি।

হাত ছাড়েন।

ছাড়ব, তার আগে কও আমারে বিয়া করবা।

না।

ক্যান ?

আপনি অশিক্ষিত। আমার বাপে অশিক্ষিত লোক পছন্দ করে না।

ট্যাকার অভাবে পড়তে পারলাম না। তুমি তো জানো আমাগো অবস্থা।

সেইটা আমার বাপেরে বোঝান!

বিয়ের পর দেখবা আমি আবার কলেজে ভর্তি হব। নাইটে পড়ব। আর দিনে চাকরি করব। তোমারে সুখে রাখব।

আহ্! হাত ছাড়েন কইতাছি।

আগে কথা দেও।

সেলিনা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে হনহন করে হেঁটে রাস্তায় উঠে আসে। সে কি আশা করেছিল লোকটা তার পিছে পিছে আসবে ? লোকটা আসে নি। সেলিনা যখন রিকশা নিয়ে বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছিল, তখনো কি সে ঐ গাছটার তলায় বসে ছিল ? লোকটাকে সে আসলে ভালোবাসতে পারে নি। কখনোই না। তাহলে এখন কেন এত কষ্ট ?

লোকটা সুদর্শন ছিল। কিন্তু আর কিছুই ছিল না তার। সেলিনার বিয়ের সময় শুনেছে লোকটা খুব খাটাখাটনি করেছে। তার ভাইদের সঙ্গে সামিয়ানা টানিয়েছে। খাবার তদারকি করেছে। বাবা তার কাজে খুশি হয়ে একশ' টাকার একটা নোট দিয়েছিলেন। সে না না করেও সেই টাকা পকেটে ঢুকিয়েছে। তারপর আর সেই আজমলকে সেলিনা দেখে নি। কখনই না, ঐ গ্রামেও না। তাদের কুড়েঘরটা, যেখানে তার বৃদ্ধ বাবা থাকতেন, একদিন ঝড়ে ভেঙে দিয়ে গেল। সেই ঘর আর উঠে দাঁড়াল না। কার জন্য দাঁড়াবে ? আজমলের জন্য ? না তার বৃদ্ধ বাবার জন্য ? তার বাবাও তখন আর জীবিত নেই।

আজমলের ঘটনাটা এখানে শেষ হয়ে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু শেষ হলো না। আরো একবার তার সাথে দেখা হয়েছিল সেলিনার। আজমল তখন আনসারদের কমান্ডার। সে আনসার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। যোগ না দিলেই বোধহয় ভালো করতো। জীবনটা অন্যরকম হতো সেলিনার।

সেলিনা হন্তদন্ত হয়ে ঝাউবন থেকে বের হয়ে এসে রিকশায় উঠে। সে কেন আজ এই ঝাউবনে এসেছিল সে নিজেও জানে না। আজ কি কোনো বিশেষ দিন ? বুড়ো রিকশাওয়ালা বিড়ি ফেলে দিয়ে রিকশায় উঠে বসে।

সেয়ানা মাইয়াগো একা একা ঝাউবনে ঢোকা ঠিক না। বুড়ো রিকশাওয়ালা বিজ্ঞের মতো বলে।

কেন ? গেলে কী হয় ?

খারাপ বাতাস লাগে।

খারাপ বাতাস লাগলে কী হয় ?

রিকশাওয়ালা ঘুরে তাকায়। মেয়েটা কি তার সাথে ঠাট্টা করছে ? তার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না ? ততক্ষণে ঝাউবনে সত্যি সত্যি খারাপ বাতাস লেগেছে। হু-হু বাতাস যেন এই বন ভেঙে ফেলবে। বৃষ্টি আসবে নাকি ? রিকশাওলা দ্রুত প্যাডেলে চাপ দেয়।

রিকশা ছুটছে শহরের দিকে। সেখানে তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়ি এই রাস্তায় ঢুকে না বলে রেখে আসতে হয় শহরের বাইরে। মতি মাস্টারের বাড়ির পাশের গলিতে।

এই সময়টায় ক্যান্টিন খালি থাকে, নিরিবিলিতে পেপার পড়া যায় চা খেতে খেতে। ডাঃ গিয়াস ক্যান্টিনে ঢুকে চা দিতে বলল আর পেপারটা। পেপারটা সাধারণত সে এখানে বসেই পড়ে। সে ইচ্ছে করলে হাসপাতালের ডক্টরস চেম্বারে বসে চা বা পেপার দুটোই পেতে পারে। কিন্তু ক্যান্টিনটা তার ভালো লাগে। সে এই হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার।

এই যে চা।

পেপার কই ?

পেপার নাই।

পেপার নাই মানে ?

কেডা যেন নিছেগা। বলে পিচ্চিটা ছুটে চলে যায়।

বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে যায় গিয়াসের। কোনো মানে আছে! ভেবেছিল চা খেতে খেতে পেপার পড়বে। তারপর ডিউটিতে যাবে। তার ডিউটি তিনটে থেকে রাত আটটা।

স্যার, আপনি এখানে ? জুনিয়র একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

হ্যাঁ, কী ব্যাপার ?

স্যার, চিনতে পেরেছেন ? আমি ইন্টার্নশিপ করেছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তো মলি ? বসো বসো।

মেয়েটি সসংকোচে বসে।

তুমি যেন কোন মেডিক্যাল ?

স্যার, ন্যাশনাল হাসপাতাল।

ও হ্যাঁ, ওখানে আমার এক বন্ধু আছে। ডা. কল্লোল... লেখালেখি করে।

হ্যাঁ, চিনি স্যার। উনার ওয়াইফও ডাক্তার।

হ্যাঁ চিনি, ডা. ওয়ানাইজা।

জি উনার সাথেও পরিচয় আছে।

চা খাও।

না স্যার।

না কেন! এই চা দাও।

এই কেন্টিনের লাল চা'টা ভালো।

লাল চা তো আরো খাই না।

তুমি জানো দিনে তিন কাপ লাল চা খেলে হার্টের সমস্যা ১১% সলভ হয়ে যায়?

জানতাম না স্যার।

তারপর বলো কী সমস্যা?

স্যার, ওই যে সাত নম্বর বেডের মহিলাটা ...

যার সিফিলিস ধরা পড়েছে?

স্যার আপনি জানেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমার পেসেন্ট, জানব না কেন?

কিন্তু স্যার সে তো কনসিভ করেছে... এখন?

এবরশন করানো হবে কিনা? এই তো?

জি স্যার।

ডাঃ গিয়াস সিগারেট ধরালেন। সুদর্শন গিয়াস জানেন না তার এই সিগারেট ধরানোর দৃশ্য তরুণীটির খুব প্রিয়। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে।

তোমাকে একটা গল্প বলি।

জি স্যার।

এক মা, তার আটটা ছেলের তিনটা ছেলে ডেফ, দুজন অন্ধ, একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। তারপরও মহিলাটি আবার কনসিভ করেছে। কিন্তু তার সিফিলিস আছে ... তুমি এখন কী করবে?

কেন স্যার, অবশ্যই তাকে অ্যাবরশন করাব।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাঃ গিয়াস, যেন মেয়েটি ভীষণ মজার একটা কথা বলেছে।

শোন মেয়ে, তোমার কথামতো এবরশন করলে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সুরকার বিটোফেনকে হারাতাম।

মানে?

মানে আমি আট সন্তানের মা যে মহিলার কথা বললাম তিনি পৃথিবী বিখ্যাত সুরকার বিটোফেন-এর মা।

সত্যি স্যার ?

তখনি পিচ্চিটা পেপার দিয়ে গেল। আজকের কাগজে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য খবর নেই। অবশ্য খবরের জায়গাইবা কই ? সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনটা যমুনা ফিউচার পার্কের। এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শপিংমল। এত শপিংমল দিয়ে কী হবে ? একটা ইন্ডাস্ট্রি-টিন্ডাস্ট্রি করার বুদ্ধি কি কারো মাথায় আসে না। তাহলে অন্তত দেশের বেকার সাধারণ মানুষদের একটা গতি হয়...। ভেতরের পাতায় হঠাৎ একটা খবরে চোখ আটকে যায় ডাঃ গিয়াসের! চমকে উঠে সে! এইরকম একটা খবরের জন্যই কি সে অপেক্ষা করছিল ? বছরের পর বছর... বছরের পর বছর ...আজ সেই দিন ? চট করে উঠে দাঁড়াল গিয়াস, মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হনহন করে বের হয়ে যায় পেপারটা হাতে নিয়ে।

মলি খুব অবাক হলো। কষ্টও পেল একটু। অবশ্য এটাও ঠিক কোনো একটা খবরে স্যার বোধ করি আপসেট হয়েছেন। তাই বলে তাকে চা খেতে বসিয়ে এভাবে চলে যাওয়া! আর তখনি পিচ্চিটা চা নিয়ে এল। বিটোফেনের মার গল্পটা ইন্টারেস্টিং। তার মানে বিটোফেন তার মার নবম সন্তান ? এইজন্য কি নাইনথ সিম্ফনি ? কে জানে! মলি চায়ে চুমুক দেয়। বিশ্রী চা। থকথক করে ভাসছে দুধের লালচে সর। লাল চা কোথায় ? এরা নাকি লাল চা করে! তাহলে মলিকে দুধ চা দিল কেন ?

এক্স মিনিস্টার এবং বগুড়া জেলার বর্তমান এমপি ওয়াজিউল্লাহ সাহেব হঠাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন। অন্যকোনো সমস্যা নেই, শুধু কোনো কারণে কথা বলতে পারছেন না। অবশ্য ইশারায় বোঝাতে পারছেন। তাকে দ্রুত ক্লিনিকে নেয়া হলো। অত্যাধুনিক ক্লিনিক। মন্ত্রী মিনিস্টাররাই সাধারণত এই ক্লিনিকে আসেন। ডাক্তার-নার্সদের মধ্যে ছোটাছুটি লেগে গেল। কারণ এই এমপি যথেষ্ট ক্ষমতাবান। বয়স হলেও যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করে আছেন রাজনৈতিক অঙ্গনে, নিজের এলাকায় তো বটেই। তার এক ছেলে ব্যারিস্টার। বিদেশে আছে। আর এক মেয়ে কোনো একটি প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ছে, ইকোনোমিকসে অনার্স।

ডাক্তাররা দ্রুত টেস্টফেস্ট করে যা বুঝল ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। স্ট্রোক থেকে সাময়িক প্যারালাইজড। কোনো বিষয় না। সপ্তাহখানেক ফুল রেস্ট নিতে হবে। তাকে নেয়া হলো সবচে' সুসজ্জিত একটা কেবিনে। ডাবল বেড, এসি রুম। এটাচড বাথে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে। সামনের দিকটা কাচ দিয়ে ঘেরা, দিনেরবেলা ঢাকা শহরের অনেকটাই দেখা যায়। ক্লিনিকের সবচে' সিনিয়র প্রফেসর ডাঃ জাকির হোসেন নিজে এলেন, সাথে এক তরুণ সুদর্শন ডাক্তার। এমপি সাহেবের রুমে তখন তার স্ত্রী বসা। এ বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী, আর মেয়ে রোজি। ছেলেও এসেছিল। খবর পেয়ে ছেলে বিদেশ থেকে চলে এসেছে। এখন একটু বাইরে আছে।

স্লামালিকুম।

প্রফেসর বোধ করি সালাম দিলেন বিছানায় বাকরুদ্ধ অবস্থায় শোয়া এমপি সাহেবকেই।

মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমাদের মেডিক্যাল টার্মে এটা খুব বড় কিছু না। এটা অনেক সময়ই হয়। হতেই পারে।

যে-কারো হতে পারে। স্যার আপনি রেস্ট নিন, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। পাশ থেকে আরেকজন বলে।

আপনার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকবে ডাঃ গিয়াস।

প্রফেসর হাত দিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো তরুণ সুদর্শন ডাক্তারকে দেখালেন। ডাঃ গিয়াস মাথা নিচু করে জাপানি স্টাইলে বো করল। এমপি সাহেব তরুণ ডাক্তারটির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পুরুষমানুষ এত সুন্দর হয়! এই ডাক্তারটি তার দায়িত্বে থাকবে জেনে তিনি বেশ আরাম বোধ করলেন। তিনি দ্বিতীয়বার তাকালেন ডাক্তার গিয়াসের দিকে, এবারও মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ আরেকজন হলেন, সে হচ্ছে তার মেয়ে রোজি। রোজি অতটা সুন্দরী হতে পারে নি, বাবার চোয়ারে চেহারাটা পেয়েছে। মায়ের রূপের সামান্য পেলেও হতো, পায় নি। সেটা পেয়েছে ছেলেটা। তবে বড়লোকি পালিশের কারণে আর সাজগোজে রোজিকে চট করে ধরা যায় না তার চেহারাটা আসলে যে অতটা ভালো নয়।

বাবা কেমন বুঝছ ? উনি ভালো হবেন তো ? তোমাকে তুমি করেই বললাম কিন্তু। মিসেস ওয়াজিউল্লাহ বলে উঠলেন।

না না, অবশ্যই তুমি বলবেন। একটুও ভাববেন না। আমরা দেখছি উনাকে। কিছুদিন একা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। আপনারা তো অনেক সেবা করলেন, এবার আমরা একটু সেবা করি। বলে একটু হাসল।

হাসিটা অসাধারণ। রোজির বুকটা কেমন যেন করে উঠল। সে তখন থেকে ডাঃ গিয়াসের দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, লোকটি একবারও তার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকালে...

এমপি সাহেবের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয় নি। বরং আরেকটু খারাপ হয়েছে। হাত-পা নাড়াতে পারছেন না। ডাক্তাররা অবশ্য ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দিলেন না। তবে এমপি সাহেব নিজে ভেতরে ভেতরে ভালো আছেন, সব পরিষ্কার দেখতে পারছেন, বুঝতে পারছেন। সবার আবেগটা ধরতে পারছেন। তিনি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এখন যেন আরো বেশি করে টের পাচ্ছেন। ইদানীং একটা চিন্তা তার মাথায় খেলছে। সেটা হচ্ছে, জীবনটা তো তিনি ভালোই কাটালেন। শুধু ভালো বললে ভুল হবে, বেশ ভালোই কাটালেন। এটাও ঠিক তিনি প্রচুর বাজে কাজ করেছেন। সেজন্য তার কোনো আফশোস নেই। সময়ের প্রয়োজনে তাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে। কিন্তু যে ভয়টা তার ছিল সেটা তো হলো না। তিনি ভাবতেন, তিনি কেন অনেকেই ভাবেন যে পাপের শাস্তি নাকি পৃথিবীতে মানুষ পেয়ে যায়। কই তিনি তো কিছু পেলেন না! জীবনে পাপ বলতে কম করেন নি। কই কিছুই তো হলো না। এখন তিনি অসুস্থ হয়েছেন, সেটা অন্য ব্যাপার, বয়সও হয়েছে। এখন যদি এই অবস্থায় মারাও যান কোনো আফশোস থাকবে

না। তার সাম্রাজ্য তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনটা গার্মেন্টস, দুটো ইন্ডাস্ট্রি। আর ফ্ল্যাট-বাড়িঘর-দোকানের তো কোনো হিসেব নেই। সবই তিনি করেছেন দুইনম্বরি করে। কই তাকে কেউ ধরতে পারল ? মালয়েশিয়ায় ছোটখাটো একটা দ্বীপ কেনার পর দু'একটা পত্রিকা লেখালেখি করার চেষ্টা করেছে, পরে তিনি লোক দিয়ে সাইজ করে দিয়েছেন।

সেই যে একবার এক সাংবাদিক খুব হাত-পা খুলে লিখল। খুব সম্ভব সেটা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সাতদিনের মাথায় সেই সাংবাদিক হিরোইন কেসে ফেঁসে গেল। তার বাসায় দেড় কেজি হিরোইন পাওয়া গেল। শর্ষে ফুলে ভূত! পুলিশই খুঁজে পেয়েছে। ওয়াজিউল্লাহকে কিছু করতে হয় নি। শুধু দু'একটা ফোন করতে হয়েছে জায়গামতো। সেই সাংবাদিকের বড়ভাই ছুটে এসেছিল তার কাছে। তার চেহারাটা এখনো ভাসে চোখে।

স্যার, আমার ভাইটা বোকা। বুঝে নাই। মাফ কইরা দেন।

আমি মাফ করার কে ? পুলিশে ধরছে পুলিশর কাছে যাও। ওর ঘরে হিরোইন পাওয়া গেছে।

স্যার, ও কোন নেশা করে না। বিশ্বার করেন এই ব্যবসার সাথেও জড়িত নয়। আপনে মা বাপ... এবারের মতো মাফ করে দেন।

এইটা পুলিশকে বোঝাও। যাও যাও।

তারপরও সাংবাদিকের সেই বড়ভাই যায় না। শেষ পর্যন্ত দারোয়ান ডেকে মোটামুটি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করতে হয়েছে।

তরুণ ডাক্তার গিয়াস হাসিমুখে ঢুকল। সাথে দুজন নার্স। এই মুহূর্তে এমপি সাহেব একা। নার্সরা মাথার চারদিকে সেন্সরগুলো খুলে নতুন করে লাগাল। বুকের বাঁ ধার থেকে সেন্সরগুলো খুলে আবার লাগাল। মনিটর এডজাস্ট করে কী সব লিখল। তারপর ডাক্তারের নির্দেশে চলে গেল দুজনেই। ডাক্তার হাসিমুখে তাকাল তার দিকে। বলল, স্যার বোর হচ্ছেন না তো ? আর কিছুক্ষণ। তারপর...। বলে কেমন একটা হাসি দিল।

এমপি সাহেব তারপর কী সেটা বুঝলেন না। তারা তারপর আসল ট্রিটমেন্ট শুরু করবে ... এখন তাহলে কী করছে ? এ সময় রোজি ঢুকল। ডাঃ গিয়াস হাসিমুখে তাকাল। রোজির বুকটা ধক করে উঠল। লোকটা এত সুন্দর! পুরুষমানুষ এত সুন্দর হয়! মাইকেল এঞ্জেলের ডেভিডের মতো খাড়া নাক। কোঁকড়ানো চুল, ফর্সা কপালে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে! চোয়ালটা ক্লিন সেভ করার কারণে হালকা নীলচে।

আপনি আপনার বাবার পাশে বেশি না, পনের মিনিট বসতে পারেন।

কেন এত কম সময় ?

কারণ আমি উনাকে ট্রাকশন দিব, কিছু সেন্সর লাগাতে হবে।

ঠিক আছে।... আপনি যাচ্ছেন কেন, আপনিও বসুন।

না, আমি যন্ত্রপাতি রেডি করার ব্যবস্থা করি। ডাঃ গিয়াস হাসিমুখে বের হয়ে গেল।

তখনই এমপি সাহেবের মাথায় চিন্তাটা এল। আচ্ছা এই ডাক্তারের সঙ্গে রোজির বিয়ে দিলে কেমন হয় ? মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে ছেলেটাকে মনে ধরেছে। তিনি তাকালেন মেয়ের দিকে, মেয়ে তখন ঝুঁকে এসেছে তার দিকে।

বাবা, ভালো আছ তো ? আর ক'টা দিন কষ্ট কর... তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

এম পি সাহেব বলার চেষ্টা করেন— আমি ভালো আছি... ভালো হয়ে উঠব... ভালো হয়েই তোকে ঐ সুদর্শন ডাক্তারের সাথে বিয়ে দিব... ভাবিস না... তারপর তোদের হানিমুনে পাঠাব সুইজারল্যান্ডে... যতদিন ইচ্ছা থাকবি... ঐ ডাক্তারকে আমি বিশাল হাসপাতাল করে দিব... মালিকানা থাকবে তোর নামে...

বাবা মনে হয় কিছু বলতে চাইছে।

ও কিছু নয়। আপনি সরুন, আমি দেখছি।

রোজি সরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে।

বাইরে গনগনে দুপুর। গ্রীন হাসপাতালের ৫০৬ নং কেবিনের ভেতর কনকনে ঠান্ডা। কনকনে ঠান্ডায় এমপি সাহেব একা শুয়ে আছেন। যথারীতি বাকরুদ্ধ। একদিকে স্যালাইন চলছে। বুকে-মাথায় সেন্সর লাগানো। নীল মনিটরে কতগুলো কালো দাগ ঢেউ খেলে ছুটে ছুটে চলছে অবিরাম। সেই চিন্তাটাই আবার মাথায় এল এমপি সাহেবের। কই কিছুই তো হলো না তার! এখন যদি তার মৃত্যুও হয় তারপরও তিনি একজন সফল মানুষ। কেমন একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন তিনি। এবং তার বিশ্বাস তার মৃত্যু হবে না। মৃত্যুদূতকেও পয়সা দিয়ে কিনে ফেলার মতো পয়সা তার এখন আছে।

স্যার কেমন আছেন ?

এমপি সাহেব দেখলেন সুদর্শন ডাক্তারটি কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পান নি। তিনি মুখে হাসির ভঙ্গি করলেন, যার অর্থ হতে পারে ভালো; কিংবা ভালো আর থাকতে দিলে কই তোমরা ?

স্যার এখন আমি আপনি ছাড়া এই কেবিনে কেউ নেই। এই ফাঁকে কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নেয়া যাক। কী বলেন ?

এমপি সাহেব একটু অবাক হলেন। এমন কী কথা যে একা বলতে হবে! তার দু'চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। চেয়ার টেনে ডাক্তার বসল। তার চোখেমুখে কেমন একটা কৌতুকের হাসি, যেন মজার কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

স্যার তাহলে শুরু করি ?... আপনার যে রোগটা হয়েছে এটা ভালো করা সম্ভব, কারণ আমি এটারই এক্সপার্ট। বাইরে থেকে বেশ কটা ছোট-বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছি। আসলে সত্যি কথা বলতে কী, এটা কোনো রোগই না। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, আমি আপনাকে ভালো হতে দিচ্ছি না। ইন ফ্যাক্ট যাতে আপনি ভালো না হন সেরকম ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছি। আপনি আগে কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু হাত নাড়াতে পারছিলেন। এখন তাও পারছেন না। কেউ বুঝতে পারছে না, আপনাকে আস্তে আস্তে করে আমি আরো নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছি। কেন এটা করছি জানেন ?

ডাঃ গিয়াস লক্ষ করলেন এমপি সাহেবের চোখের কালো মণি দুটি অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করছে চোখের ঘোলাটে সাদা জমিনে। হাসল ডাঃ গিয়াস। ফের শুরু করল।

আপনি অন্যদের কথা শুনতে পাবেন, সব বুঝতে পারবেন, কিন্তু কিছু করতে পারবেন না। এটাই চাচ্ছিলাম। কেন এরকম করছি জানেন ?

এ সময় ঢুকল এমপি সাহেবের মেয়ে রোজি।

ওহ আপনি এসেছেন! ভালোই হলো, আপনার বাবাকে মনে হচ্ছে একটু অস্থির দেখাচ্ছে। তেমন কিছু না, প্রেসারটা একটু বেড়েছে। আমি সিডেটিভ দিয়ে দিচ্ছি... আপনি পাশে বসুন।

এমপি সাহেব খেয়াল করলেন তার মেয়ে রোজি কেমন এক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। বাবার দিকে খেয়াল আছে বলে মনে হয় না, যেন সে এই হারামজাদা ডাক্তারের জন্যই এসেছে। আচ্ছা ডাক্তারটা কোনো উঁচু ধরনের রসিকতা করছে না তো ? এসব কী বলছে ? তবে হঠাৎ করে তিনি বুঝতে পারছেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হতে যাচ্ছে... তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক হতে বলছে যেন! সেই যে একবার বিরোধী পক্ষের এক নেতাকে একটু শিক্ষা দিতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে গিয়েছিল... তখন তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করেছিল, তাকে ভেতর থেকে কেউ বলে উঠেছিল... 'সাবধান ওয়াজিউল্লাহ...'। আজও কেউ একজন ভেতর থেকে চিৎকার করছে 'সাবধান ওয়াজিউল্লাহ... সাবধান!'

এমপি সাহেব চেষ্টা করলেন চিৎকার করে বলতে, ঐ হারামজাদাটা আমার সর্বনাশ করতে যাচ্ছে। আমি মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছি। আমাকে মেরে ফেলবে...।

রোজি খেয়াল করল তার বাবাকে কেমন অস্থির দেখাচ্ছে।

বাবা, শান্ত হও। কষ্ট হচ্ছে ? ডাক্তার সাহেব এখনি তোমাকে সিডেটিভ দিবেন ... ভয় নেই...।

এমপি সাহেব চিৎকার করে বলতে চাইলেন, তোমরা আমাকে এই ডাক্তারটার হাত থেকে বাঁচাও। ওই হারামজাদা একটা বদমাইশ, আমার সর্বনাশ করতে যাচ্ছে ...। কিন্তু তার ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল, তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। চোখ দুটো ছটফট করে উঠল।

স্যার, তাহলে শুরু করি ? মেয়ে চলে যাবার পর ডাঃ গিয়াস আবার শুরু করেন।

এমপি সাহেব ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেন, ডাক্তারটা আবার এসেছে।

এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি বহুদিন। মনে আছে স্যার, আজ থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে আমার বিধবা মা গিয়েছিলেন আপনার কাছে ? আমি তখন খুব ছোট, দুধের বাচ্চা। বাবা মারা গেছেন। খুবই বিপদ আমাদের তখন। মা'র সামান্য চাকরি, সেটাও গ্রাম্য পলিটিক্সের কারণে যায় যায় অবস্থা। তখন খুব সামান্য একটা সাহায্যের আশায় মা গিয়েছিলেন আপনার কাছে। বলাই বাহুল্য, আমার মা খুবই সুন্দরী একজন মহিলা। আমাকে দেখেই সেটা বুঝতে পারছেন...। ডাক্তার সুন্দর করে হাসে। কেঁপে উঠেন মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ। তার মনে পড়েছে ... মনে পড়েছে ...

এমপি ওয়াজিউল্লাহ্ তার অফিসেই ছিলেন। নিজ এলাকার অফিস। সরকারি বাংলোতেই একটা রুমে অফিস করেন তিনি। মাঝে-মধ্যে এখানে এলে এখানেই উঠেন। তার বাড়ি অবশ্য কাছেই। প্রভাব খাটিয়ে বাংলোটি তিনি নিজের বাড়ির বিশ গজের মধ্যে তৈরি করেছেন। এলাকার কিছু লোকজন লেখালেখি করে বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে, তবে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি তারা।

স্যার, একজন মহিলা দেখা করতে চায়।

কে ?

নাম বলছে সুরমা বেগম।

সুরমা বেগমটা আবার কে ?

ঐ যে স্কুলের টিচার...

কোন টিচার ?

ঐ যে স্যার... যারে নিয়া গ্যাঞ্জাম।

মিনিস্টারের পিএ কেমন একটা ভঙ্গি করে। ভঙ্গিটা ওয়াজিউল্লাহর পরিচিত। তিনি এবার বললেন, ভেতরে পাঠাও।

ভেতরে যে ঢুকল তাকে পরী বললে কম বলা হয়। অসাধারণ এক রূপসী মহিলা। এই এলাকায় এইরকম একজন নারী আছেন আর তিনি জানেন না। এমপি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। আজ রাতটা এখানেই কাটাবেন, ঢাকা যাবেন না। কী সমস্যা আপনার ? মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললেন কথা কটা।

আমি এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের বাঙলা টিচার।

আচ্ছা।

আমি স্যার বিধবা মানুষ।

কী হয়েছিল আপনার স্বামীর ?

রোড অ্যাকক্সিডেন্ট তিনি...

আচ্ছা... আচ্ছা... কবে ?

বছরখানেক হলো।

এমপি সাহেব দুঃখিতভাবে মাথা নাড়েন। যদিও তার ভালো করেই মনে আছে, তার কোম্পানির ট্রাকের তলায় থেতলে গিয়েছিল এই মহিলার স্বামী এবং সেটা ছিল নিছক একটা দুর্ঘটনা।

সমস্যায় কথা বলুন।

স্যার এলাকার লোকজন আমাকে আর স্কুলে চাচ্ছে না।

বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যা। এলাকার লোকজন হুমকি দিচ্ছে আপনার চাকরি খাবে, এলাকা ছাড়া করবে। তাই তো ?

জি জি, আপনি তাহলে আমার বিষয়টা ...

হ্যাঁ জানি। বিষয়টা আমার কানে এসেছে।

স্যার, আমাকে বাঁচান। আপনি বললেই ...

অবশ্যই বাঁচাব। এলাকার মাথামোটা কিছু লোকের কারণে...। দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন এমপি।

সুরমা বেগম মুগ্ধ হয়ে যান এমপি সাহেবের ব্যবহারে। অথচ এই লোকটা সম্পর্কে কতজনে কত বাজে কথা বলেছে।

তার স্বামী শহিদ বেঁচে থাকতে একবার বলেছিলেন, লোকটা ভালো না।

কোন লোকটা ?

আমাদের এলাকার এমপি'র কথা বলছি!

তুমি কী করে জানলে! মানুষ তাকে ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছে এমনি এমনি ? নিশ্চয়ই ভালো কিছু আছে তার মধ্যে।

হ্যাঁ ভালো তার একটা জিনিসই আছে।

কী ?

টাকা... ভালো টাকা আছে তার।

টাকা আছে আমাদের স্কুলে অনেক টাকা ডোনেশন করেছেন...

হ্যাঁ আজ ভালো আগামীকাল কী হয় দেখ।

আমি আপনার বিষয়টা দেখব, আগামীকালই দেখব।

অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি উঠি স্যার ?

বসেন, চা খান।

না না।

ততক্ষণে দু'কাপ চলে এসেছে। সাথে দুটা গোল বিস্কুট। বিস্কুটটা সুরমা বেগম খেলেন না, তবে চা'টা সুরমা বেগমের বেশ ভালো লাগে। সুন্দর চা। চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে স্যার আজ আমি উঠি ?

একটু দাঁড়ান। এমপি সাহেব আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ান। তারপর ঘুরে এসে হঠাৎ একটা হাত চেপে ধরেন সুরমা বেগমের। তোমার জন্য সব করব, শুধু আজকের রাতটা আমার সঙ্গে থাক।

হতভম্ব সুরমা বেগম শিউরে উঠেন। বোধহয় একটা চিৎকারও দেয়ার চেষ্টা করেন। সেই চিৎকার বাংলোর বাইরে পৌঁছায় না। খুব কাছেই একটা তক্ষক ডাকছিল তার সঙ্গে সুরমা বেগমের চিৎকার ... আর অন্যান্য নিয়মিত বনজ শব্দাবলি মিলে যে নতুন এক সাউন্ডস্কেপ তৈরি হলো তা কেউই ধরতে পারল না।

সুদর্শন ডাক্তার ঠিক তার মাথার উপর ঝুঁকে আছে। মুখে হাসি।

স্যার বুঝলেন তো, ঐ রাতেই আমার মা বাড়ি ফিরে সুইসাইড করেন। আর আমার অবস্থাটা চিন্তা করেন... বাবা নেই মা নেই... কী একটা জীবন গেছে আমার। কী কষ্টে যে মানুষ হয়েছি! উফ চিন্তা করলে আমি এখনো শিউরে উঠি। তবে বড় হয়ে যেদিন আমার মা'র ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম সেদিনই ঠিক করেছিলাম, স্যার আপনাকে একটা শিক্ষা দিব। স্যার আপনি তো কিছুদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও ছিলেন। শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে তারপর গেলেন ...। যাক বাদ সেই প্রসঙ্গ, তো যেটা বলছিলাম, কীভাবে একটা শিক্ষা দেই আপনাকে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ শুনলাম আপনি এখানে ভর্তি হয়েছেন। আমি অন্য হাসপাতাল ছেড়ে ছুটে এসেছি। ভাবখানা এমন যেন আমি আপনার মহা ফ্যান, আপনাকে বাঁচানোই আমার ধ্যানজ্ঞান... হো হো...।

ডাক্তারের হাসি দেখে শিউরে উঠলেন এমপি সাহেব।

স্যার, আমি স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি এই পৃথিবীর শাস্তি পৃথিবীতেই পেতে হয়। আপনাকেও পেতে হবে। সেই ব্যবস্থা আমিই করব। একটু আগে বলেছিলাম না স্যার আমি মানুষ হয়েছি... আসলে স্যার মানুষ হই নি, আমি অমানুষ হয়েছি, শুধু আপনার জন্য...। কথাগুলো ফিসফিস করে বলল ডাক্তার গিয়াস। এই সময় রোজি ঢুকল। হাসিমুখে উঠে দাড়াল ডাঃ গিয়াস।

আপনি ?

বাবার কাছে আজ আমি থাকব।

না না, সে-কী! আমরা আছি তো উনার কাছে। আপনি কেন রাত জেগে খামকা কষ্ট করবেন ? ...

তাতে কী ? মেয়েরা কি বাবার সেবা করতে পারে না ?

অবশ্যই পারে কিন্তু উনার এখন যে সেবা দরকার সেটা আপনারা পারবেন না, পারব আমরা।

আপনি শিখিয়ে দিলে আমিও পারব।

তা হয়তো পারবেন।

চা খাবেন ?

চা ?

মা ফ্লাস্কে করে জেসমিন টি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জেসমিন টি অবশ্য কখনো খাই নি

জেসমিন টি কীভাবে বানায় জানেন ?

কীভাবে ?

খুব সোজা। জেসমিন ফুলের সবুজ কলি কিছু জোগাড় করতে হবে, তারপর সবুজ বৃতিটা সরিয়ে ভ্রূণ ফুলটাকে কুচি কুচি করে কেটে শুকাতে হবে... রোদে শুকানো চলবে না।

তারপর ?

তারপর ওটাকে কিছুদিন বদ্ধ কৌটায় রেখে দিলেই হলো। ঐটাই জেসমিন টি।

তাই নাকি ? এত সোজা!

হ্যাঁ দাঁড়ান, আপনাকে দিচ্ছি...

এমপি ওয়াজিউল্লাহ চোখ বড় বড় করে শুনছেন। তার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে। রোজি হারামজাদি আসলে আমার জন্য আসে নি, এসেছে এই হারামজাদা ডাক্তারটার জন্য। ওয়াজিউল্লাহ সাহেব তার চোখ দেখেই টের পাচ্ছেন। তিনি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পারছেন সর্বনাশ হতে যাচ্ছে তার এবং তার পরিবারের। আর ডাঃ গিয়াস দেখল মেয়েটি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছে, তার হাত কাঁপছে। খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে। মেয়েটি উত্তেজিত। অসম্ভব উত্তেজিত।

রাত বারোটার দিকে ডাঃ গিয়াস এগিয়ে এল এমপি সাহেবের কানের কাছে, ফিসফিস করে বলল, স্যার আশা করি জেগে আছেন। জেগে থাকারই কথা, কারণ আপনার সমস্ত কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে। স্যার দোষ নিবেন না, আপনার মেয়ে কিন্তু এখনো যায় নি। পাশের রুমেই আছে। আমি পাশের রুমে যাচ্ছি, আপনার মেয়ে রোজি আমার কাছে কিছু আশা করছে... সবকিছু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমনটা ঠিক আমি চাচ্ছিলাম না। তারপরও আমিও তো মানুষ। ভেবে দেখুন পাশের বেডে বাবা অসুস্থ, আর মেয়ে অন্য পুরুষের সাথে...। ডাক্তার কেমন করে হাসে। স্যার, এই ব্যাপারগুলো সে পেয়েছে আপনার কাছ থেকে।

জিনের প্রবাহ, হা হা। সুদর্শন ডাক্তারটাকে কুৎসিত লাগে এমপি সাহেবের। স্যার, জিনের প্রবাহ সম্পর্কে আরেকদিন আপনাকে বলব, খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনার বদগুণগুলো কীভাবে আপনার ছেলেমেয়ের মধ্যে ...।

কথা শেষ না করেই ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়, ধীর পায়ে পাশের রুমে ঢোকে।

ওরা কি দরজাটা বন্ধ করে দিল ? ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠার চেষ্টা করেন এমপি সাহেব। পারেন না, শুধু কেঁপে কেঁপে উঠেন।

এমপি সাহেব চোখ খুলে দেখেন তার উপর ঝুঁকে আছে ডাঃ গিয়াসের মুখ। সেই মুখে মৃদু হাসি। লোকটার দাঁতগুলো পর্যন্ত সুন্দর, ঝকঝকে পরিপাটি। কী দিয়ে দাঁত মাজে ? এত সাদা! যদি সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠতে পারি তবে ঐ প্রত্যেকটা সাদা দাঁত নিজের হাতে হাতুড়ি দিয়ে ভাঙব...

স্যার, কেমন আছেন ? আজকে স্যার জিন প্রসঙ্গটা আপনাকে বলব। আপনার ভালো লাগবে না জানি, তারপরও বলব। স্যার বোধহয় বিজ্ঞানী মেন্ডেলের নাম শুনেছেন ? তিনিই স্যার এই বিষয়টাকে প্রথম সামনে নিয়ে আসেন। সেই মটরশুটি নিয়ে গবেষণা করে বের করেন এই মহান আবিষ্কার। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন স্যার, মেন্ডেল ১৮৮৪ সালে মারা যান, তার মৃত্যুর ১৬ বছর পর এই বিষয়টা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ... স্যার কি বিরক্ত হচ্ছেন ? হলেও কিছু করার নেই। আমি আপনাকে জানাতে চাচ্ছি বা আপনার জানা উচিত আপনার চরিত্র কীভাবে আপনার সন্তানের ভেতর যায়। আপনি তো জানেন স্যার মানুষের শরীরের প্রতিটি দেহকোষে ক্রমোজোমের সংখ্যা ৪৬, কিংবা বলা যায় ২৩ জোড়া। মানুষ যখন জানতে পারল একটি ক্রমোজমে একটি ডিএনএ অনু থাকে ... কী হলো স্যার চোখ বন্ধ করে ফেলছেন যে ... স্যার স্যার ... জিন কিন্তু একক কোনো রাসায়নিক অনু নয়... স্যার...

কী বলছেন আপনি বাবাকে!

ডাঃ গিয়াস চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখে রোজি দাড়িয়ে।

আপনি ?

আপনি বাবাকে কী বলছেন ?

ওহ, আপনি শুনে ফেলেছেন ? হা হা হা। আসলে কি জানেন উনি একা একা বোর ফিল করবেন ভেবে আমি উনাকে একটা গল্প শোনাচ্ছিলাম।

গল্প ?

হ্যাঁ গল্পই। জিনের গল্প। বিষয়টা আমার প্রিয়।

কোন জিন ?

জিন তো একটাই।

গল্পটা আমি শুনতে চাই।

শুনতে চান ?

হ্যাঁ, আরেকটা কথা।

কী ?

শুনতে চান না বলুন চাও।

হুঁ।

কী হলো বলুন।

বেশ, শোন... একবার হলো কী এক সরকারি কর্মচারী অফিসের পুরনো ফাইলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পুরনো প্রদীপ পেয়ে গেল। সেটা ঘষতেই বিশাল এক জিন এসে হাজির। বলল, হুকুম করুন মালিক। আপনার তিনটি ইচ্ছে পূরণ করব।

কর্মচারীটি ভয় পেয়ে গেল। কোনোমতে বলল, আগে এক ঢোঁক হুইস্কি খেতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কি চলে এল। হুইস্কি খেয়ে তার মাথা ঘুরে গেল। বলল, আমাকে এমন দ্বীপে নিয়ে যাও যেখানে থাকবে শুধু সুন্দরী নারীরা। তাই হলো। সুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত দ্বীপে সে একা!

মালিক, আপনার তৃতীয় ইচ্ছা কী ?

এমন ব্যবস্থা করে দাও যেন আমাকে আর কোনো কাজ না করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো তার পুরনো সরকারি অফিসে!

আপনি বাবাকে এই জিনের গল্প শোনাচ্ছিলেন ?

হ্যাঁ। কেন ?

না আমি ভেবেছিলাম...

কী ভেবেছিলেন ?

না কিছু না...

ডাঃ গিয়াস টের পায় রোজী মেয়েটি অন্যরকম এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেশ তাহলে তোমাকে অন্য একটা গল্প শোনাই।

শোনান।

গল্পটা কিন্তু একটু এ্যাডাল্ট।

বাবা !

ভয় নেই তিনি ঘুমিয়েছেন।

তাহলে বলুন।

পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের কীভাবে দেখতে চায় জানো ?

কীভাবে ?

তারা স্ত্রীকে তিন রূপে দেখতে চায়।

তিন রূপ মানে ?

এক রান্নাঘরে সে হবে ইকোনোমিস্ট, দুই বাড়িতে আর্টিস্টিক... আর তিন বিছানায় হবে...

কী হবে ?

ডেভিল।

আচ্ছা!

কিন্তু পুরুষরা পায় কিন্তু তার উল্টোটা।

যেমন ?

যেমন রান্নাঘরে আর্টিস্টিক, বাড়িতে ডেভিল আর বিছানায় ইকোনোমিস্ট!

ড: গিয়াস ভেবেছিল রোজি হাসবে কিন্তু সে হাসল না। মেয়েটার হয়েছে কী আজ !

চলুন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

না। গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গি করে গিয়াস।

কেন ?

বাহ্ আমি এখন ডিউটিতে। তাছাড়া আমি একজন ডাক্তার।

কিছু না বলে গট গট করে বের হয়ে যায় রোজি। প্রতি পদক্ষেপে তার অভিমান।

সাতদিন পরও এমপি সাহেবের খুব একটা উন্নতি হলো বলে মনে হলো না। চোখের পাতা নাড়তে পারছেন, আর অন্য সবকিছুই স্থির। তবে চিন্তা-চেতনা পরিষ্কার। আজ সকাল থেকে ডাক্তারকে দেখতে পাচ্ছেন না। স্ত্রী বসে আছে পাশে। স্ত্রীর সাজগোজটা মনে হচ্ছে একটু বেশি। স্বামী মরতে বসেছে। আর উনি...। এই সময় মেয়ে ঢুকল। মেয়েকে দেখেই বোঝা গেল সে এসেছে ডাক্তারের জন্য। অস্থির ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর বলেই ফেলল, মা, ডাক্তার গিয়াস কই ?

দেখছি না তো।

আচ্ছা আমি দেখছি।

রাতে ডাক্তারকে পাওয়া গেল। মিসেস ওয়াজিউল্লাহ তখনো কেবিনে বসা।

আরে ম্যাডাম, আপনি কখন এসেছেন ?

তুমি কোথায় ছিলে সারাদিন! অনেকটা অনুযোগের সুরে বলেন মিসেস ওয়াজিউল্লাহ।

লাইব্রেরিতে। উনার ডিজিজটার উপর একটু পড়াশুনা করে এলাম। উনি কিন্তু অনেকটা ভালো, তাই না ?

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ঘোড়ার ডিম! চিৎকার করতে চেষ্টা করেন এমপি সাহেব। তিনি টের পাচ্ছেন তার স্ত্রী কেমন এক চোখে দেখছে ডাক্তারকে। তবে কি মেয়ের মতো সেও মজেছে ?

আরো গভীর রাতে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল বোধহয় এমপি সাহেবের। হঠাৎ ঘুমটা ছুটে গেল। তার চোখের সামনে একটা মুখ। ডাক্তার।

স্যার... আই অ্যাম ভেরি সরি...। ডাক্তার হাসে।

অদ্ভুত একটা বিষয় ঘটল। পাশের রুমে আপনার স্ত্রী... একরকম জোরই করলেন আমাকে। আপনি কোনো শব্দ পান নি তো আবার ? আমি আবার মেয়েদের না বলতে পারি না, সে যে বয়সেরই হোক। ব্যাপারটা বাজে হয়ে যাচ্ছে, মা মেয়ে, ছি ছি ...।

ডাক্তার জিভ কাটার কপট ভঙ্গি করে। এমপি সাহেব তার মুখের জমানো থুথুগুলো থু করে ছুড়ে দেয়ার চেষ্টা করেন, পারেন না। থুথু ঠোঁটের কোণা দিয়ে নিচে নেমে আসে।

স্যার বোধহয় আমার মুখে থুথু ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন ? আফশোসের ভঙ্গি করে ডাক্তার, জিভে চুকচুক শব্দ করে। আন্তরিকভাবে টিস্যু দিয়ে থুথুটা মুছে দেয়। স্যার, একটা জিনিস খেয়াল করেছেন ? আপনার কোনো কিছুই পরিকল্পনা মতো হচ্ছে না এখন। কিন্তু একটা সময় গেছে আপনি যা ভেবেছেন তাই হয়েছে। সেই যে রোকসানা মেয়েটার কথা মনে আছে স্যার ? আপনার কাজের মেয়ে ছিল। পেপারে কিন্তু বেশ লেখালেখি হয়েছিল। আমি পরে খোঁজ নিয়েছি। আপনি যদিও সুকৌশলে কেসটা ধামাচাপা দিয়েছেন। কিন্তু আমি সব ঘটনা উদ্ধার করেছিলাম। তারপর মহিমের কথা মনে আছে স্যার ? এটা আমাদের গ্রামেরই ঘটনা। ছোট্ট ছেলে যাকে আপনি গুলি করে মেরেছিলেন। আপনার প্রথম খুন। লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন হাওরের জলে ...। তারপর প্রমাণ মুছতে এক সাধুকে মেরেছিলেন। তবে একটা ছোট্ট ভুল করেছিলেন স্যার। সাধুর লাশটা গুম করতে ভুলে গিয়েছিলেন। আপনি ভেবেছিলেন ওর খাটিয়াটা জোয়ারের জলে ভেসে যাবে, যায় নি !

মলি করিডরে অপেক্ষা করছিল। তার হিসেব মতে এখনই ডাঃ গিয়াসের আসার কথা। হলোও তাই। গিয়াসকে দেখা গেল।

স্যার।

আরে তুমি! এখানে ?

স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

খুব জরুরি নাকি ?

হ্যাঁ একটু জরুরি।

সিওর। চল আমার রুমে।

চলুন।

তারা ডক্টরস রুমে চলে এল। এটা গিয়াসের নিজস্ব রুম। এই হাসপাতালে চলে আসার পর এই রুমটা তাকে দেয়া হয়েছে। রুমটা যথেষ্ট গোছানো নয়। সিগারেটের বাজে গন্ধ। কোনো মেয়েই গন্ধটা পছন্দ করবে না। মলির তো নয়ই, কিন্তু কেন যেন আজ মলির ভালো লাগল গন্ধটা। ঘরের দক্ষিণের দেয়ালের অর্ধেকটা জুড়ে বিশাল জানালা। পর্দা লাগানো নেই। ঢাকা শহরের অর্ধেকটাই যেন দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারটাও ভালো লাগে মলির।

বলো কী সমস্যা তোমার ?

কোনো সমস্যা নেই। আপনি কেন এ হাসপাতালে চলে এলেন ?

ব্যক্তিগত কারণে চলে এসেছি বলতে পার। কেন, তোমার কি ওখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে ?

না না। আপনার জায়গায় যিনি এসেছেন তিনিও খুব ভালো মানুষ।

তাহলে ?

গিয়াস ঘড়ির দিকে তাকায়। মলি নিজেকে প্রস্তুত করে। আজ একটা কথা বলতেই হবে তাকে।

স্যার।

বলো।

স্যার আমি... আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

মলির ধারণা ছিল লোকটি চমকে উঠবে। লোকটি কোনো কথা বলল না। যেন এমনটাই স্বাভাবিক। সে মলির একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, সেক্ষেত্রে আমি কি তোমাকে একটা চুমু খেতে পারি ?

মলি কম্পিত গলায় বলল, পারেন।

তারপর ডাঃ গিয়াস যে কাজটি করল তার জন্য ঠিক সেই মুহূর্তে মলি প্রস্তুত ছিল না। মলি কি ভুল করল ? মলির বারবার মনে হচ্ছিল বিশাল জানালায় কোনো পর্দা নেই... কেউ দেখে ফেলছে নাতো ? আশেপাশে কোনো বড় বিল্ডিংও নেই অবশ্য। কিন্তু কতগুলো পাখি উড়ছিল স্থির ডানায় খোলা আকাশে। মনে হচ্ছিল তারা যেন জানালার ফ্রেমে বন্দি। কী পাখি ওগুলো ? পাখি কি মানুষের অন্যরকম আচরণ ধরতে পারে... ? আবেশে চোখ বুজে আসে মলির... একটা পুরুষালী ঘামের গন্ধ তাকে গ্রাস করে!

বিষয়টা ধরা পড়ে গেল। সিনিয়র প্রফেসররা হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন। ম্যাল প্রাক্সিমাস হচ্ছিল। ডাঃ গিয়াসকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। তাকে সাসপেন্ড করা হলো। এবং সবশেষে একজন মাননীয় দেশবরেণ্য সাবেক মন্ত্রীকে ভুল ট্রিটমেন্ট করার অপরাধে তাকে থানা-পুলিশ হয়ে দাঁড়াতে হলো আসামির কাঠগড়ায়।

শুরু হলো সওয়াল জবাব। যার জন্য গিয়াস ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সরকারপক্ষের উকিল তাকে কঠিন সব প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে শুরু করল।

আপনি তাহলে মন্ত্রী মহোদয়কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

কারণটা আমি এজাহারে বলেছি।

প্রকাশ্যে আবার বলতে কি বাধা আছে ?

আছে।

কী বাধা ?

গিয়াস উত্তর দেয় না। উকিল আবার নতুন করে শুরু করে।

আপনার মা একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন বলে শোনা যায়। তার চরিত্র ভালো ছিল না বলেও জনশ্রুতি আছে। এ ব্যাপারে আপনার কোনো মতামত ?

গিয়াস জবাব দেয় না। তার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। উকিল ফের শুরু করে।

আপনার মা মাননীয় মন্ত্রীর নামে কুৎসা রটনার চেষ্টা করেন বলে শোনা যায়।

এই সময় গিয়াসের পক্ষের উকিল চেঁচিয়ে উঠে, অবজেকশন ইয়োর অনার!

বিষয়টি নিয়ে পত্রিকাওলারা গরম হয়ে ওঠে। খুবই মুখরোচক ঘটনা। যেখানে একজন মাননীয় সাবেক মন্ত্রী জড়িত। জড়িত একজন ডাক্তার। সুন্দরী নারীর প্রসঙ্গও আসছে বারবার। আবার ডেট পড়ে কোর্টে। ক্লান্ত গিয়াস আবার কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। আবার সেই হাড়গিলের মতো সরকারপক্ষের উকিল তার সামনে।

BDeBooks.com

আপনার মা আত্মহত্যা করেছিলেন ?

হুঁ।

কেন ?

এজাহারে একবার বলেছি।

প্রকাশ্যে বলার সমস্যা আছে ?

আছে।

তার মৃত্যুর সময় আপনার বয়স কত ছিল ?

গিয়াস উত্তর দেয় না। তার চোখ আটকে যায় সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো একজোড়া চোখের দিকে। চেনা চোখ। মলি। মলি দাঁড়িয়ে আছে। সে এখানে কী করছে ? কৌতূহলী দর্শক ? সরকারপক্ষের উকিল আর কী সব বলল কানে ঢুকছে না গিয়াসের। তার পক্ষের উকিলের চিৎকার শুনতে পেল, সেই কমন ডায়লগ, অবজেকশন ইয়োর অনার!

দ্রুত বিচার আইনে তার জেল হয়ে গেল। অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরো দুই বছরের জেল।

ওদিকে মন্ত্রী মহোদয় খুব দ্রুতই ভালো হয়ে উঠলেন। তার মেয়ে রোজি আত্মহত্যা করল। আর মন্ত্রী স্ত্রীকে ডিভোর্স করলেন। গলা টিপেই মারতেন। চেষ্টাও করেছিলেন। অণ্ডকোষে লাথি খেয়ে সে চেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেল। বিষয়গুলো এত দ্রুত ঘটল যে তিনি শোকার্ত হয়ে উঠার সুযোগটা পর্যন্ত পেলেন না, আর প্রতিশোধের স্পৃহা তাকে আকণ্ঠ মাতাল করল... যে-কোনো মূল্যে ঐ জেল হওয়া ডাক্তার গিয়াসকে জেল থেকে বের করে এনে নিজের হাতে মারবেন। তবে যদি তার জানটা শান্তি পায়।

জহির খবর কী ?

ব্যবস্থা হচ্ছে স্যার।

কীভাবে ব্যবস্থা হচ্ছে ?

স্যার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে।

তারা কী বলল ?

বলল সম্ভব, তবে ২০-এর মতো লাগবে।

সেটা দিব। কবে বের করবে ?

সামনের জুন মাসে।

জুন মাসে কেন ?

ঐ মাসে কিছু কারাবন্দিকে অন্য জেলে নেয়া হবে, তখন তাকে সরিয়ে ফেলা হবে।

কিন্তু মিডিয়া ?

মিডিয়া সামলাব আমরা।

আচ্ছা ঠিক আছে, টাকার ব্যবস্থা কর।

জি স্যার।

একটু যেন শান্তি লাগে। তার জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে হারামজাদা ডাক্তারটা। ঐ হারামজাদাকে নিজের হাতে তিলে তিলে মারবেন তিনি। প্ল্যানও ঠিক করে ফেলেছেন। ঠিক তখনই মোবাইলটা বেজে উঠল।

হ্যালো কে ?

স্যার আমি ডাঃ গিয়াস।

ভীষণ চমকে উঠলেন মন্ত্রী সাহেব। এটা কী করে সম্ভব ? সে তো জেলে।

স্যার জেল থেকেই ফোন করেছি। জেলখানায় মোবাইল ম্যানেজ করা কোনো বিষয় না।

শুয়রের বাচ্চা কী বলতে চাস ?

স্যারের শরীর ভালো ? খবর পেয়েছি আপনার মেয়ে রোজি সুইসাইড করেছে। আসলে ওর দোষ নেই। প্রেমে পড়ে গিয়েছিল আমার। সিরিয়াস প্রেম। যেই মুহূর্তে জেনে গেল আমার কেস, ব্যস সহ্য করতে পারল না। সত্যিই আমি দুঃখিত। ... আসলে কী জানেন স্যার, ভালোবাসার ক্ষেত্রে, মুখের কথা যখন শেষ হয় তখন শরীর কথা বলতে চায়... আর আপনার মেয়ে রোজি আর আমার ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো...

চুক চুক করে জিভে শব্দ করল ডাঃ গিয়াস। এমপি সাহেব একবার ভাবলেন ফোন কেটে দিবেন। কিন্তু কী মনে করে দিলেন না।

স্যার কি ফোন রেখে দিলেন ? ... স্যার রাখবেন না। একটা খবর আছে আপনার জন্য। আপনার একমাত্র ছেলে যে আপনার স্ত্রীর সুন্দর চেহারাটা পেয়েছে আর কুৎসিত মনটা পেয়েছে আপনার। ইতোমধ্যেই সে অনেক কুকর্মও করে ফেলেছে বলে খবর আছে বাজারে। কাগজেও মাঝে মাঝে বের হয়। সেই ছেলে... স্যার আমি দুঃখিত... খুবই দুঃখিত।

ফোনটা কেটে গেল। আর তখনই ল্যান্ড ফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো ?

স্যার বলছেন ?

হ্যাঁ।

স্যার আপনাকে একটু হাসপাতালে আসতে হবে। আপনার ছেলে সালু এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে...

হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল এমপি সাহেবের। নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তিনি। চরকির মতো সবকিছু ঘুরছে তার চারদিক। তিনি পাশের দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

মেয়ের আত্মঘাতী হওয়ার শোক কোনো মতে সামলে উঠলেও একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক সামলে উঠতে একটু সময় লাগল এমপি ওয়াজিউল্লার। তবে তার ডিভোর্সি স্ত্রী খবর শুনে স্ট্রোকে মারা গেলেন। এমপি সাহেব হঠাৎ করে তার সাজানো-গোছানো নিজস্ব পৃথিবীতে একা হয়ে গেলেন। তবে কি তিনি পৃথিবীতেই তার পাপের শাস্তি পেতে শুরু করেছেন ? একটা একটা করে পাপের ঘটনা মনে পড়ছে তার। তবে কি প্রত্যেকটা পাপের জন্য তার আলাদা আলাদা করে শাস্তি পেতে হবে ? তার মনে পড়ছে সেই প্রথম ঘটনাটা। মহিম। বাচ্চা একটা ছেলেকে তিনি গুলি করেছিলেন। তিনি আসলে বুঝেন নি। ঐ কুদ্দুস হারামজাদা তাকে মিস গাইড করেছিল। তারপর ঘটনা ধামাচাপা দিতে গিয়ে তিনি এক সাধুকে মারলেন। সাধুটা কি ভণ্ড ছিল ? তিনি কনফিউজড।

সাধুকে মেরে যখন তিনি ফিরে আসছিলেন তখন নৌকা বাইছিল কুদ্দুস। ওয়াজিউল্লাহ একটা সিগারেট ধরালেন। হাওরের জলে ঠান্ডা বাতাস। নৌকাটা দুলছে।

স্যার, দ্বীপে আর কেউ আছিল না তো ?

না।

তাইলে বিষয়ডা খালি আপনার আমার মধ্যে রইল, কী কন স্যার ?

ওয়াজিউল্লাহ একটু অবাক হয়ে তাকালেন বিশ্বস্ত কুদ্দুসের দিকে। তারপর চারদিকে তাকালেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। ধুধু পানি। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কুদ্দুস নৌকা থামা।

কী হইল ?

ঐ যে শাপলাটা আন তো।

কুদ্দুস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ধুধু পানির মধ্যে একটা মাত্র শাপলা মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। আশেপাশে দুটো গোল সবুজ পাতা।

শাপলাডা আন। তোর ভাবিরে দিমু।

বুদ্ধি খারাপ না, ভাবিসাব খুশি হইব।

কুদ্দুস বইঠা রেখে পানিতে ঝাঁপ দেয় । দুলে উঠে নৌকা । ছপ ছপ শব্দে এগিয়ে যায় কুদ্দুস শাপলাটার দিকে। আর তখনই হাওরের প্রান্তরে আরেকটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। শব্দটি কুদ্দুসের প্রিয়, কিন্তু এবার আর শব্দটি কুদ্দুস উপভোগ করতে পারল না। হাওরের সবুজ পানি লাল করে আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ, পিতা : মকিম আকন্দ, সাং : পান্তাপারা, তলিয়ে যায় নিঃশব্দে। আর কী আশ্চর্য, লাল পানিটুকু শাপলা ফুলটাকে ঘিরে ভাসতে থাকে। তরুণ ওয়াজিউল্লাহ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন সেইদিকে।

কিংবা দ্বিতীয় ঘটনাটা। তখন তিনি সদ্য এমপি হয়েছেন। নিজ এলাকা থেকে মাইক্রোবাসে করে একটা কৃষ্ণমূর্তি সরিয়ে ফেলছিলেন। রাত গভীর। নিজের এলাকা বলে ভয়ের কিছু নেই। তারপরও কেমন যেন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। পথে হঠাৎ একটা আনসার তার গাড়ি থামানোর জন্য হাত তুলল। গ্রামে তখন ডাকাতি হচ্ছিল বলে তার উদ্যোগেই আনসার বাহিনীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

হল্ট! তরুণ আনসার কমান্ডার চেঁচিয়ে উঠল।

ড্রাইভার তাকাল তার দিকে। অর্থাৎ গাড়ি থামাবে না টান দিয়ে চলে যাবে। এমপি সাহেব একটু দ্বিধা করলেন যেন, তারপর বললেন, গাড়ি রাখ।

গাড়ি থামল। আনসার কমান্ডার গাড়ির ভেতর উঁকি দিল।

কার গাড়ি ? এত রাতে কে যায় ? টর্চ ফেলল গাড়ির ভেতর।

ঐ মিয়া স্যাররে চিন না ? ড্রাইভার খেকিয়ে উঠে।

আনসার কমান্ডার চিনতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট দিল। কিন্তু ততক্ষণে সে বুঝে ফেলেছে পেছনের সিটে চট দিয়ে ঢেকে নেয়া হচ্ছে দক্ষিণ পাড়ার কৃষ্ণ মূর্তিটাকে।

স্যার কৃষ্ণমূর্তি কই নেন ?

এমপি সাহেব গাড়ি থেকে নেমে আসেন। বিরাট বোকামো হয়েছে। কাজটা আজ না করলেও হতো। আর নিজে দায়িত্ব নেয়াটাও ঠিক হয় নি। হঠাৎ করেই প্রস্তাবটা চলে আসায় মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। একটা পোড়ামাটির মূর্তি তিন কোটি টাকা!

তোমার নাম কী ?

স্যার আজমল।

তুমিই আনসার কমান্ডার ?

জি স্যার, আজমল আনসার কমান্ডার।

বাড়ি কই ?

এই এলাকায়ই।

তোমার সঙ্গের আর লোকজন কই ?

ওরা খাইতে গেছে স্যার।

আজমল, এদিকে আস।

এমপি ওয়াজিউল্লাহ্ ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। আজমলকে ইশারায় ডাকলেন। এগিয়ে গেল আজমল। তারপর আজমলকে নিয়ে একটু আড়ালে যান এমপি সাহেব। পকেটে হাত দেন। একতাড়া নোট বের করে আনেন। মুখে বলেন, রাখ।

কী!

এখানে পঁচিশ হাজার টাকা আছে।

টাকা ক্যান স্যার ?

এই মূর্তির বিষয় যেন কেউ না জানে! মুখ খুলবা না।

কী বলছেন স্যার ? আপনি এসব কী বলছেন। ছি ছি...।

তরুণ এমপি একটু অবাক হলেন। এবার বাম পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট লুগ্যার পিস্তলটা বের করলেন। অন্ধকারে আনসার কমান্ডার আজমল ঠিক ধরতে পারল না কী হতে যাচ্ছে। শুধু ধুপ করে একটা শব্দ শুনল সে। যেন শব্দটা হলো অনেক দূরে। কিন্তু তার বুকের বাম দিকে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল। সে অবাক হয়ে দেখল, এমপি সাহেব ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠে যাচ্ছেন। গুলি ছাড়া রাইফেলটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল আজমল, পারল না। ধুপ করে আছড়ে পড়ল সবুজ কিন্তু অন্ধকার ঘাসে।

সেই আনসার কমান্ডারের অবাক হওয়া মুখটা হঠাৎ দেখতে পান তিনি। তার চেহারাটা কি ঐ ডাক্তার গিয়াসের মতো ? সেও কিন্তু সুন্দর ছিল। বেশ সুপুরুষ। তার কি কোনো প্রেমিকা ছিল ? স্ত্রী ? কী নাম তার ?

সেলিনার শরীরটা ভালো নেই। সাধারণত এই সময়টা সে বই পড়ে কাটায়। কিন্তু আজ কোনো কারণে অস্থির লাগছে। বইয়ে মন বসাতে পারছে না। অবশ্য বইটাও ঠিক মন বসানোর মতো কোনো বই না। অদ্ভুত একটা গল্প।... একটা লোক ছুটছে একটা ঘোড়ার পাশাপাশি... ঘোড়াটাও সমানতালে ছুটছে। লোকটা ঘোড়াটার পিঠে একটা হাত দিয়ে... অর্থাৎ ঘোড়াটাকে স্পর্শ করে ছুটছে। আর ভাবছে... মানুষ একসময় কী বোকা ছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটত। অথচ ঘোড়াকে স্পর্শ করে কত দ্রুত ছোটা যায়!... এর মানে কী ? ভ্রূ কুঁচকে আসে সেলিনার। দ্বিতীয় একটি বই হাতে নেয় সেলিনা। প্রথম গল্পটা পড়তে গিয়ে একটু হাসি পায় সেলিনার। এটা কি সম্ভব ? লোকটা যেভাবে লিখেছে তাতে মনে হচ্ছে সত্যি... এক ভদ্রলোকের কিছু মানুষ দরকার তার একটা আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য। ভাড়াটে মানুষ। খোঁজ-খবর নিয়ে লোকটা গেল এফডিসিতে।

কী ধরনের মানুষ চান ?

মানে ?

লুঙ্গি-শার্ট... পরা সাধারণ মানুষ, পনের টাকা পার ডে। আর শার্ট-প্যান্ট ২০ টাকা।

আর কোর্ট-প্যান্ট ?

টাই থাকবে ?

থাকতে পারে।

তাহলে ত্রিশ টাকা পার ডে...।

গল্পটাতে বেশ মজা পেয়ে গেল সেলিনা... হাসির গল্প মনে হচ্ছে... ঠিক তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠল। এসময় কে আসতে পারে ? দরজা খুলে অবাক হলো। উকিল সাহেব । মুখভর্তি হাসি।

এই সময় তুমি ? সেলিনা অবাক হয়।

কোর্টে একটা মজার ঘটনা ঘটছে।

কী ঘটনা ?

তোমাদের গ্রামের আজমলরে মনে আছে ? ঐ যে আনসার কমান্ডার ছিল। আমার বাসায়ও একবার ডিউটি করছে। মনে আছে তোমার ?

ধ্বক করে উঠে সেলিনার বুকটা। মনে আছে, মনে থাকবে না কেন! মনে মনে ভাবে সেলিনা।

সে মারা গেছে তুমি জানতা ?

সেলিনা কেঁপে উঠে যেন। খাটের বাজু ধরে বিছানায় বসে পড়ে।

জানতাম। কেন কী হইছে ?

তারে কে মারছে জানো ?

কে ?

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ। নিজের হাতে। বিরাট ঘটনা। কেসটা আমার হাতে আসছে। আজমলের পক্ষের উকিল আমি। রাষ্ট্রপক্ষ। কিন্তু মজার ঘটনা কী জানো ? মিনিস্টারের লোকজন একটা ব্রিফকেস নিয়া আসছে আমার কাছে। ব্রিফকেসে কত টাকা জানো ?

আমার জানার দরকার নাই। তুমি কি তার পক্ষের উকিল হইছ ?

তাই ভাবতাছি। লাভ কি মরা মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়? তুমি কী কও? তা ছাড়া টেস্টটিউব বেবির অনেক খর্চা। খোঁজ নিছি।

সেলিনা কথা না বলে ভেতরে চলে আসে। রান্নাঘরের পাশের সাদা বেসিনে হর হর করে বমি করে। উকিল সাহেব ছুটে এসে ধরেন সেলিনাকে, কী হইল তোমার ?

কিছু না।

বমি করলা যে ?

বমি মানুষ করে না ? সেলিনা আঁচলে মুখ মুছে পানি খায়। কোনোরকমে টলতে টলতে বিছানায় যায়।

উকিল সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তবে কি টেস্টটিউব বেবির খর্চা বেঁচে গেল ? তার বুকের গভীরে ভেতরে আনন্দের এক গভীর ফল্গুধারা বয়ে যায়।

যদ্দুর মনে পড়ে ঘটনাচক্রে তখন সেলিনার স্বামী একটা জটিল ক্রিমিনাল কেসে ফেঁসে গিয়েছিল। কেসটা ইন্টারেস্টিং! যে লোকটা সারাদিন সেলিনার স্বামীর সঙ্গে কাটাল, সেই লোকটাই কী করে দুপুরে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে খুন করে ? এরকম অদ্ভুত ঘটনা তখনই সম্ভব, যখন খুনির একজন জমজ ভাই থাকে। এবং ছিলও! সেলিনার স্বামী তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে ঘটনা উল্টে যায়।

আসামিপক্ষ তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। তখন রাষ্ট্রই তার নিরাপত্তায় এগিয়ে আসে। এক সকালে আনসারদের একটা ছোট্ট দল তাদের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আসে। পুলিশই আসত, কিন্তু সেই সময় অন্য একটি জরুরি বিষয়ে পুলিশের ক্রাইসিসের কারণে আনসার বাহিনী আসে। তাদের কমান্ডার ধরনের লোকটিই এগিয়ে আসে। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিধ্বস্ত চেহারাটা খুব চেনা ঠেকে সেলিনার। তারপরও সেই কমান্ডার পরিচিত ভঙ্গিতে দাঁত বের করে হেসে বলেছিল, তোমারে পাহারা দিতে আইয়া পড়লাম। আমারে চিনছ ? আমি আজমল। আজমল কমান্ডার কমান্ডারের দুই হাতে দুটো পাকা আনারস।

সেলিনা ঠিক খুশি হতে পারে নি। অস্বস্তি বোধ করেছে। গ্রামের একটা সহজ-সরল ছেলে একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। মেয়েরা বিচক্ষণ বলে সেলিনা সাড়া দেয় নি। সে কি আজমলের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল ? মেয়েরা দেখতে পায়।

কিন্তু আজমলরা পায় না। নইলে কোন দুঃসাহসে আনসার কমান্ডার আজমল এক গনগনে দুপুরে আবার একদিন সেলিনার শোবার ঘরে এসে হাজির হয় ?

আপনি এখানে কী চান ?

কিছু না। একটা জিনিস আনছিলাম তোমার জন্য।

কী ?

একটা সুতা।

সুতা ?

হ্যাঁ লাল সুতা।

সুতা কেন ?

ছাপড়ার দ্বীপের সাধুর কাছ থাইকা আনছি।

ক্যান ?

তোমার জন্য। কোমরে বাঁধলেই...। আজমল থেমে যায়।

আমার বাচ্চা হবে ?

হুঁ।

ও, আমার বাচ্চা হয় না এইটাও তাইলে আলোচনার বিষয়। এক্ষণ বাইর হোন ঘর থাইকা।

অপ্রস্তুত আজমল ঘুরে দাঁড়ায়। লাল সুতাটা তখনও তার হাতে। আজমল চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ডাকল সেলিনা।

দাঁড়ান।

আজমল দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঐ সুতা কোমরে বাঁধলেই আমার সন্তান হবে ?

সাধু সেইরকমই বলছে।

ছেলে সন্তান হবে না মেয়ে সন্তান হবে ?

তা জানি না। তবে সন্তান হবে।

এসব আপনি বিশ্বাস করেন ?

আজমল কথা বলে না। সেলিনা এগিয়ে আসে তারপর আস্তে করে বলে—

আপনি তাইলে পরায়া দেন।

আজমল হতভম্ব হয়ে তাকায় সেলিনার দিকে। সেলিনা আরো কাছে আসে। সাধুর লাল সুতাটা গোল হয়ে মাটিতে পড়ে, তার উপর গোল হয়ে পড়ে সেলিনার শাড়ি আর সবশেষে ছায়াটা। বাইরে তখন ধুধু রৌদ্র। উপরে, অনেক উপরের নীল আকাশে একটা চিল উড়ছিল। জীবনানন্দ দাশের সোনালি ডানার চিল।

জেলখানায় ডাঃ গিয়াসের সময়টা খুব খারাপ কাটছিল বলা যায় না। কারণ তার মনে হচ্ছে জেলের বাইরে থেকে ভেতরে ক্রাইম করা অনেক বেশি নিরাপদ। তবে এই নেটওয়ার্কটা করতে তার সময় ব্যয় হয়েছে টানা একবছর। আসলে তার বোকামোর জন্যই ক্লিনিকে ম্যাল প্রাক্সিমাসের বিষয়টা ফাঁস হয়ে যায়। নইলে ...। তবে এখন মনে হচ্ছে মন্দের ভালো হয়েছে। জেলখানার ভেতর থেকেই বরং অনেক সুবিধা। এই যেমন এমপি সাহেবের ছেলের গাড়ি দুর্ঘটনার ব্যাপারটা। কিছুই না। ওরাই ব্যবস্থা করেছে। একদিন ওদের একজন এসে বলল, স্যার মিনিস্টারের পোলারে মারা কোনো বিষয় না। আপনে বললেই ...

জেলখানার ভেতর থেকে ?

অবশ্যই।

কীভাবে ?

কোনো বিষয় না। এ তো সুতার খেলা।

সুতার খেলা মানে ?

আপনে মিনিস্টারের পোলারে বিদায় করতে চান তো ? ... সুতার খেলা।

তুমি তোমার ম্যাজিকের কথা বলছ ?

ম্যাজিক ধরলে ম্যাজিক।

যা বলবে পরিষ্কার করে বলো।

তার ছেলে যে গাড়ি চালায় ঐটা হলো প্রোটন সাগা। ঐ প্রোটন সাগার চাকার দুই সুতার নাট তিন সুতা কইরা দিমু, ব্যস। গাড়ির স্পিড ষাটের উপর উঠলেই খেল খতম।

তুমি তাকে চেন নাকি ?

চিনুম না মানে ? সে তো আমার লাইনের লোক। যে কেইসে ধরা খাইছি, ইয়াবা কেইসে, সে ঐটার বস। রাগ কি মনে করেন স্যার আমারও কম আছে ?

আমার অবশ্য রাগ না, অন্যকিছু।

সেই অন্যকিছুটা কী স্যার ?

ডাঃ গিয়াস উত্তর দেয় না। সে ভাবে এই চক্রটা তাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ? তার কথা এত শুনছে কেন ? তারা কি তাকে কোন পাকচক্রে ফেলে দিচ্ছে ? নাকি...।

গিয়াস ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকায়। লোকটার চোখ দুটি সবসময় চকচক করে, মনে হয় লোকটা গভীর কোনো নেশা করে আছে। কে জানে হয়তো করে। জেলখানার ভেতর এসব কোনো ব্যাপার না। লোকটা যখনই তার কাছে আসে তখন কেমন একটা গন্ধ পায় গিয়াস। কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্যের গন্ধ কিনা কে জানে! যেমন আজ পাচ্ছে।

তুমি কি নেশা কর ?

করি স্যার।

কী নেশা ?

স্যার এইটা বলব না। নিষেধ আছে!

আচ্ছা ঠিক আছে, বলার দরকার নেই।

ডাক্তার সাব ?

বলো।

জেলের বাগানের পাশের ঘাসে শুয়ে ছিল ডাঃ গিয়াস, সে এসে বসল তার পাশে। গিয়াস অবশ্য এই আসামিটাকে বেশ পছন্দ করে। সে যে একজন ম্যাজিশিয়ান ঠিক এই কারণে নয়। লোকটার একধরনের সারল্য আছে, যেটা তাকে আকর্ষণ করে।

ম্যাজিশিয়ান ?

জি স্যার।

আজ কী ম্যাজিক দেখাবা ?

স্যার একটা হাতের কাজ দেখেন।

দেখাও।

স্যার, এই যে আমার ডান হাত আর এই আমার বাম হাত। দেখছেন ?

দেখলাম।

স্যার, এখন ধরেন এইটা আমার বাম হাত এই যে ডান হাত। এটা আরেকজনের... এই দেখেন।

এ-কী! কী করে করলা ?

আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে ডাঃ গিয়াস। ম্যাজিশিয়ান হাসে।

এই ম্যাজিকটা আমারে শিখাও।

সত্যি শিখবেন স্যার ?

শিখব।

এই যে স্যার আপনের নিজের ডান হাত আর বাম হাত। দুইটাই আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু ধরেন গিয়া যদি আলাদা দুইটা হাত হয়...?

তারপর সত্যি সত্যি শেখায়। কী চমৎকার কৌশল। মানুষই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে।

স্যার, আরেকটা কথা।

গিয়াস ভাবে ম্যাজিক নিয়েই কোনো কথা। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ম্যাজিশিয়ান হঠাৎ গলা নামিয়ে বলে, জরুরি কথা।

কিছু বলবা ?

জি।

বলো।

পরশু জেলখানার পানির টাঙ্কিতে মরা বিড়াল পাওয়া যাইব একটা।

এটাও ম্যাজিক নাকি ?

না এটা সত্যি।

তারপর ?

তারপর ধরেন টাঙ্কি পরিষ্কার করা হইব।

তারপর ?

তারপর টাঙ্কি ভরতে একটা পানির গাড়ি ঢুকব।

তারপর ?

তারপর ধরেন ঐ গাড়ির ক্রাঙ্ক শ্যাফটে ঝুইলা দুইজন আসামি বাইর হয়া যাইব জেলখানা থাইকা।

আরেকজন কে ?

আরেকজন স্যার আমি। তবে আমি আর ফিইরা আসব না। আপনাকে ফিইরা আসতে হবে। তবে স্যার একটা কথা ...

কী ?

আপনার কাজটা আমি কইরা আসি আপনার হয়া ? তাইলে আর কোন রিস্ক থাকে না।

না। নিজের হাতে করতে চাই ...। ডাঃ গিয়াসের চোয়াল শক্ত হয়ে আসে।

এমপি সাহেব নিজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভিতরের বিশেষ একজনের সঙ্গে কথা বলেন। জুন মাসের আগেই ব্যাপারটা করা যায় কিনা ? তিনি টাকা দিতে প্রস্তুত। কারণ তার আর তর সইছে না। ঐ ডাক্তারের মৃত্যু তিনি নিজের হাতে ঘটাতে চান। তার চোখের সামনে তিলে তিলে তিনি মারবেন। হাত-পা বেঁধে তার বাথটাবে নিজ হাতে মাথাটা চেপে ধরে থাকবেন। বেলজিয়াম থেকে আনা বাথটাবটার নিচের ঝকঝকে আয়নায় তার সুন্দর চেহারায় তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে চান।

ওরে আমি নিজের হাতে পানিতে চুবায়া মারমু। দম বন্ধ হয়া ঐ শালার ডাক্তার মরব। তিলে তিলে...

স্যার ভুল বললেন।

মানে ?

মানে স্যার বিষয়ডা আমি ভালো জানি।

কী জানো ?

এই যে পানিতে দম আটকায়া মরার বিষয়টা। মানুষ পানিতে ডুবলে দম আটকায়া মরে না।

তাহলে কীভাবে মরে ?

ভয়ে, স্ট্রোক করে।

তুমি কি ডাক্তার ?

জি-না। মেডিক্যালে চান্স পাইছিলাম, পড়ি নাই।

পড় নাই ক্যান ?

তখন স্যার ফ্যামিলির অবস্থা ভালো ছিল না। টাকাপয়সার টানাটানি!

হুম। ওয়াজিউল্লাহ্ ভাবেন একটা প্রচণ্ড ধমক দিবেন তার পিএ-কে। কিন্তু কী মনে করে দিলেন না। ইদানীং তিনি নিজের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন টের পাচ্ছেন। তার পিএ জহির গলা খাকারি দেয়। তার মানে সে আরো কিছু বলতে চায়।

কিছু বলবা ?

স্যার অভয় দিলে বলি।

বলো।

স্যার তাড়াহুড়া কইরেন না।

তাড়াহুড়া আর কি, আমি জলদি জলদি ঐ ডাক্তারের শেষ দেখতে চাই।

ও তো এমনেই শেষ।

না শেষ না, ওরে আমি নিজের হাতে শেষ করমু।

তাইলে স্যার আর একটা মাস অপেক্ষা করেন।

এক মাস ?

ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছটফট করেন এমপি সাহেব ভেতরে ভেতরে। নাকি তাকে নিয়ে যাবেন তার সেই গোপন আস্তানায়, মৃত্যুকে যেখানে তিনি শিল্পপর্যায়ে নিয়ে গেছেন ? কী আশ্চর্য তার মনেই নাই ঝিলনছড়ির সেই পাহাড়ের কথা। তার গোপন সাম্রাজ্য !

বান্দরবান শহর থেকে চিম্বুক পাহাড়ের দিকে যেতে হঠাৎ বামদিকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল ভেতরে একটি আস্ত পাহাড় কিনেছিলেন ওয়াজিউল্লাহ। জায়গাটার নাম ঝিলনছড়ি। পাশেই কোথায় একটা ছড়ি আছে। ছড়ি মানে ছোটখাটো একটা ঝরনা। নেহায়েত শখেই কিনেছিলেন তিনি। সেই পাহাড়ে তৈরি করলেন একটি বাংলো। একবারে নিজের পছন্দমতো। সেখানে একটা সুইমিং পুলও তৈরি করে ফেললেন। পাহাড়ের উপর সুইমিং পুল। ছেলেমেয়ে-স্ত্রী নিয়ে মাঝে মাঝে আসেন। মাঝে মাঝে অন্য নারী নিয়েও আসেন। এখানে জীবন অন্যরকম। এখানে কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। পাহাড়ি আদিবাসীরা তাকে ঘাঁটায় না। তিনিও ঘাঁটান না। তার পাহাড়ের চারিদিকে সবুজ আনারসের বাগান। বাইরে সবুজ কিন্তু ভেতরে প্রচুর মিষ্টি।

একদিন এক পাহাড়িকে ধরে আনল তার লোকজন।

স্যার, এই শালা বাগানের আনারস চুরি করছে।

কয়টা ?

অনেক। প্রায় একশ'।

আনারসগুলা কই ?

ঐগুলা উদ্ধার করছি।

ওর কাঁধে ঐটা কী ?

কী জানি, মনে হয় পানি। চামড়ার ভিস্তিতে পানি।

ঐটা খোলো

পাহাড়িটা অবশ্য কোনো কারণে কথা বলছিল না। মুখ গোজ করে দাঁড়িয়ে। তার কাঁধের চামড়ার ভিস্তিটা নামানো হলো। সে অবশ্য প্রথমটায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। পারল না। ভিস্তি খোলার পর যেটা বেরিয়ে এল সেটা দেখে সবাই লাফিয়ে সরে গেল। জিনিসটা ওয়াজিউল্লাহর পছন্দ হলো। তিনি সেটা রেখে দিলেন। ছেড়ে দিলেন তার নীল পানির সুইমিং পুলে। পাহাড়িকে বিদায় করার হলো একশ' সবুজ আনারস দিয়ে। এমপি সাহেবের লোকজন এই প্রথম অবাক হলো তার আচরণে।

পানির গাড়ির ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটে ঝুলে দুজন বের হয়ে এল। যথেষ্ট পরিশ্রম হলো। গাড়িটা একটু দূরে এসে আলো-আঁধারিতে থামল। গাড়ির ড্রাইভার সিগারেট ধরাল। সিগারেট গাড়ি চালাতে চালাতেও ধরানো যায়। কিন্তু আজ অন্যরকম নির্দেশ আছে। একটা সিগারেট পুড়ে শেষ হতে যতটা সময় লাগে তার আগেই তারা দুজন বের হয়ে এল গাড়ির তল থেকে। একটু দূরে একটা সবুজ সিএনজি অপেক্ষা করছিল। তাতে চড়ে বসল তারা।

ডাক্তার সাব, মনে রাইখেন আপনার কিন্তু ফিরতে হইব আইজ রাইতেই। গাড়ি কিন্তু পানি নিয়া আবার ঢুকব দুই ঘণ্টা পর।

আমার মনে আছে।

আর পিছনে জিনিস আছে। লোডেড।

সবই ছকে বাঁধা কাজ। দুইনম্বর কাজ। কিন্তু এই দুইনম্বর কাজটিই এরা করে একনম্বর বিশ্বস্ততায়। বিশাল এদের নেটওয়ার্ক। ভেতরে ভেতরে ডাঃ গিয়াস অবাক হয়। আচ্ছা এই বিশ্বস্ততা যদি এরা ভালো কাজে ব্যয় করত তাহলে কি হতো ? তাহলে কি পারত গিয়াস প্রতিশোধ নিতে ? না... আসলে মানুষ কখন খারাপ হয় ? মানুষ কি আদৌ খারাপ হয় ? না হতে চায়! মানুষ আসলে অমলকান্তির মতো রোদ্দুর হতে চায়... গিয়াস বিড়বিড় করে তার প্রিয় একটি কবিতার কয়েক লাইন... যে লাইনগুলো সে ভুলতে চায় কিন্তু পারে না... আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, অমলকান্তি সেসব কিছু হতে চায় নি। সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল...।

নির্দিষ্ট জায়গায় সিএনজি থামে। সিএনজিওলা গলা নামিয়ে বলে, আমি এইখানেই থাকব। কাজ শেষ হইলে আইসেন। সময় কিন্তু মাত্র দুই ঘণ্টা।

পেছনের ক্যারিয়ারে রাখা জিনিসটা নিয়ে নেমে যায় গিয়াস। সে কি পারবে ? খবরের কাগজটা ফেলে জিনিসটা কোমরে গুজে নেয়। সে চালাতে জানে না। তবে জেলখানায় ম্যাজিসিয়ান ট্রিগার টানার একটা চমৎকার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে।

গিয়াস বিশাল গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। ভেতরে কতজন মানুষ আছে ? যতজনই থাকুক তাকে নির্দিষ্ট একটি ঘরে পৌছাতে হবে, সম্ভব হলে কোনোরকম রক্তপাত ছাড়াই। অবশ্য ভেতর থেকেও সাহায্য আসার কথা আছে। দেখা যাক ...।

দেয়ালের গায়ে ছায়ার মতো মিশে আছে গিয়াস। পাশেই আরেকটা জমাট অন্ধকার নড়ে উঠল !

ভিতরে ঢুকবেন ?

হ্যাঁ।

আমার সাথে আসেন।

জমাট অন্ধকারকে অনুসরণ করল গিয়াস। বাড়ির পেছনে একটা ছোট্ট দরজার পাশে দাঁড়াল জমাট অন্ধকার, দেখিয়ে না দিলে বোঝার উপায় নেই যে এখানে একটি দরজা আছে।

ঢুকে যান, ভেতরে আরেকজন আছে আপনার জন্য।

গিয়াস নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল। তার হাতে ছোট্ট পিস্তলটা প্রস্তুত। নিজেকে পেশাদার খুনির মতো লাগছে তার। সে কি সত্যিই খুনি !

এমপি সাহেব তিনতলার সুরক্ষিত ঘরে বোতল নিয়ে বসেছেন। মুখটা খুলে তখনো ঢালেন নি। দরজায় ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হলো। বিরক্তিতে ভ্রু কোঁচকাল তার। কার এত বড় স্পর্ধা এই সময় এই ঘরে ঢুকে।

কে ?

আমি।

চমকে উঠলেন এমপি সাহেব। দরজায় ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মহিম ? মহিমকে তিনি কখনো দেখেন নি। নাকি একবার দেখেছিলেন ঠিক মনে পড়ে না। খুব সম্ভব একবার ঈদের সময় নতুন কাপড়ের জন্য এসেছিল তাদের পুরো পরিবার। তিনি অবশ্য দেন নি, হাকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মহিম কি ফিরে এল, যাকে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছিলেন ? তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠেন, কে ?

স্যার, আমি বরফ আনছি।

ওফ! নিঃশ্বাস ফেলেন ওয়াজিউল্লাহ। কাজের ছেলেটা বরফ নিয়ে এসেছে।

রেখে যা।

ছেলেটি বরফ রেখে চলে যায়। তার একটু পরে আবার শব্দ হলো দরজায়। বিরক্তি নিয়ে তাকালেন ওয়াজিউল্লাহ। আবার কে এল ? এ-কী! তিনি চমকে উঠলেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডাঃ গিয়াস। হাতের পিস্তলটা খুব আলগোছে ধরা। তবে ধরার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এটা ব্যবহার করতেই এসেছে।

তু-তুমি। জেল ভেঙে পালিয়েছ ?

হ্যাঁ স্যার, আমি ডাঃ গিয়াস। ভয় পেলেন ?

কথা বলেন না ওয়াজিউল্লাহ সাহেব। হঠাৎ পরাজিতের মতো ভাঙা গলায় বলেন, আমাকে মারতে এসেছ ?

সেরকমই প্ল্যান ছিল।

তারপর ?

এখন প্ল্যান একটু বদলেছি।

কীরকম ?

আপনাকে ঠিক এখনি মারব না।

কী করবে ?

নতুন একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়

কী আইডিয়া ?

শুনতে কি স্যার আপনার ভালো লাগবে ? মনে হয় না।

গিয়াস ওয়াজিউল্লার পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখা ইনসুলিনের সিরিঞ্জটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্যারের বোধহয় ডায়বেটিক আছে ? ইনসুলিন নিতে হয়। তবে ইনসুলিনের সিরিঞ্জ দিয়ে কাজ হবে না। এই সিরিঞ্জগুলি তিন সিসির বেশি নয়। তারপাশের ঐ দশ সিসির সিরিঞ্জটা দিয়ে হতে পারে। স্যার, আপনার টেবিলে ইনজেকশনের এত সিরিঞ্জ কেন ? ড্রাগ টাগ নিচ্ছেন নাকি আজকাল ? তবে স্যার ঐ দশ সিসির সিরিঞ্জটা পেয়ে আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে ...

আর তখনই গিয়াসকে চমকে দিয়ে ওয়াজিউল্লাহ্ ঐ দশ সিসির সিরিঞ্জটা নিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন গিয়াসের দিকে। গিয়াস অবশ্য তৈরি ছিল। চট করে সরে যায়। এই বয়সে এত বড় ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হয় নাই এম পি ওয়াজিউল্লাহ সাহেবের... বেকায়দায় আছড়ে পড়েন তিনি। মাথা ঠুকে যায় মেঝেতে। জ্ঞান হারান তিনি। হাত থেকে ছিটকে পড়ে তার হাতে ধরা সিরিঞ্জটি। তাতে সুবিধা হয় গিয়াসের। চট করে তুলে নেয় সিরিঞ্জটা। ওয়াজিউল্লাহর ডান হাতের রগে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে ছোট্ট একটা বাবল ঢুকিয়ে দেয় সে। খুব ছোট্ট বাবল অবশ্য বলা যাবে না। দশ সিসির একটা বাবল। যা একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি করে ধমনী ধরে এগিয়ে যাবে ওয়াজিউল্লাহর হার্টের দিকে। অবশ্য এমপি সাহেবের হার্ট বলে যদি কিছু থাকে! নিয়মানুযায়ী সেটা তার হার্টের উপরের দিকে কিছুটা জায়গা দখল করে নিবে। কিন্তু মানুষের হার্ট চাইবে ভেতরের সমস্ত রক্ত পাম্প করতে। এক্ষেত্রে পারবে না বলে হার্টের গতি বেড়ে যাবে অস্বাভাবিকভাবে। তারপর ...

এ সময় নড়েচড়ে উঠেন ওয়াজিউল্লাহ। জ্ঞান ফিরেছে।

স্যার, আপনার জ্ঞান ফিরেছে ভালোই হলো। আপনার জন্য ছোট্ট একটা ইনফরমেশন। দশ সিসি আয়তনের একটা বাবল ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি আপনার

ধমনীতে। মৃত্যু ... জাস্ট নকিং এট দ্যা ডোর! তবে আমার ধারণা আপনি কিছু সময় পাবেন। সাংবাদিক আর অন্যান্য লোকজনদের খবর দিতে পারেন। তারা জানুক আমি কীভাবে জেলখানা থেকে বের হয়ে এসে আপনাকে হত্যা করেছি। স্যার, আপনার কি মনে হয় কেউ বিশ্বাস করবে আপনার কথা ? বিদায় স্যার !

ডাঃ গিয়াসের হিসাবে অবশ্য একটু ভুল ছিল। সে জানত না যে আজমল সাহেবের রক্ত বা ধমনীর প্রাচীর ঐ দশ সিসি বাবলের বাতাসটাকে খুব সহজেই এ্যাবজর্ব করে নিবে। কখনো কখনো মানুষ এভাবেই বেঁচে উঠে। বেঁচে গেলেন ওয়াজিউল্লাহ দশ সিসির মৃত্যুফাঁদ থেকে, আর তার ব্যক্তিগত সি সি ক্যামেরায় ধরা পড়ল গিয়াস। সে যে জেলখানা থেকে এখানে এসেছিল সেটাও প্রমাণিত। আর ঈশ্বরের কি খেলা, পানির গাড়ির ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট ভেঙে পড়ল গিয়াসকে নিয়ে জেলগেটে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়ল ডাঃ গিয়াস। এবার অপরাধ আরো বেশি গুরুতর আরো ভয়ঙ্কর!

জেলখানার কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিষয়টি গোপন রাখল, এটা তাদের দুর্বলতা। এবং একটা সমঝতায় এল ওয়াজিউল্লাহর সাথে। ঠিক হলো ওয়াজিউল্লাহ সাহেবের কথামতোই সব হবে। তার হাতে তুলে দেয়া হবে ডাঃ গিয়াসকে আগামী মাসের কোনো এক দিনে।

ডান্ডাবেরি পরানো অবস্থায় বিশেষ সেলে রাখা হয়েছে গিয়াসকে। শরীরে কিছু অতিরিক্ত ওজন নিয়ে চলাফেলা করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাছাড়া অন্যকোনো সমস্যা নেই গিয়াসের।

স্যার!

আরে ম্যাজিশিয়ান তুমি ? গিয়াস অবাক হয়, তুমি না আমার সঙ্গে বের হয়ে গেলে ?

আপনার কারণে আবার আসতে হলো। সেলের পাশের ড্রেন পরিষ্কার করতে করতে সাবধানে কথা বলে ম্যাজিশিয়ান। কিন্তু স্যার এটা কী করলেন, ওরে গুলি করলেন না কেন ? আপনার হাতে তো জিনিস ছিল... ভিতরেও আমাদের লোক ছিল!

লম্বা করে শ্বাস ফেলে গিয়াস। তাকে খুব বিচলিত মনে হয় না।

আমার অন্যরকম প্ল্যান ছিল।

কিন্তু এখন তো সব গোলমাল হয়া গেল।

তাই দেখছি।

আজ রাতে আপনাকে সরায়ে নিবে এখান থেকে। তাস এখন ওয়াজিউল্লাহর হাতে। তবে...। এদিক ওদিক তাকায় কয়েদি।

কিছু বলবা ?

স্যার, তাসের একটা খেলা দেখবেন ?

কিন্তু তাস তো এখন ওয়াজিউল্লাহর হাতে।

হেসে ওঠে ম্যাজিশিয়ান তার কথা শুনে।

সেটাই তো আপনারে দেখাইতে চাই, তাস কীভাবে হাতবদল হয়।

বেশ দেখাও।

অবশ্য খেলাটা দেখানোর সুযোগ পায় না সে, চট করে সরে যায়। আর তখনই একজন সেন্ট্রিকে দেখা যায় এদিকে আসতে। জেলখানার এইপাশটা নিরিবিলি। সচরাচর সেন্ট্রি আসে না, আজ কেন আসছে কে জানে! গিয়াসকে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে। কাজেই ম্যাজিশিয়ানকে সরে যেতে হলো।

সেই রাতেই গিয়াসকে ডেকে তোলা হলো। একটা ময়লা ভেজা কাপড়ে তার চোখ বেঁধে ফেলা হলো। তারপর ডান্ডাবেরি পরা অবস্থায় তাকে তোলা হলো সম্ভবত একটা প্রিজন ভ্যানে। কোথায় নিচ্ছে ওরা তাকে ? অন্য কোনো জেলে ? কে জানে। সময়টা আন্দাজ করতে পারল না, তবে গাড়ি চলার ধরনে টের পেল কোনো উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে নেয়া হচ্ছে তাকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে হলো। মাথা ঠুকে গেল প্রিজন ভ্যানের ছাদে। কতক্ষণ গাড়ি চলেছে বলা মুশকিল। ছয়ঘণ্টা সাতঘণ্টা কে জানে! তারপর হঠাৎই থেমে গেল গাড়ি। তাকে নামানো হলো। কোনো কথা নেই, ফিসফাস শব্দ শুনল দু'একবার। কোনো উচ্চ শব্দ নেই। অন্য একটা গাড়িতে তোলার আগে তার ডান্ডাবেরি খোলা হলো। তবে শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। তারপর তাকে যে গাড়িটাতে তোলা হলো, গাড়ির ধরনে মনে হলো মাইক্রোবাস। প্রথমে প্রিজন ভ্যানটা চলে যাওয়ার শব্দ শুনল গিয়াস। তারপর স্টার্ট নিল তাদের মাইক্রোটা। এবার কথা বলল কেউ একজন।

চল সোজা স্যারের বাংলোয়।

ঘুরাপথে, না সোজাপথে ?

সোজাপথে। এত রাতে সমস্যা কী ? সাথে জিনিস আছে।

স্যার কি বাংলোতেই ?

না, স্যার কালকে আসব।

এরা নিশ্চয়ই স্যার বলতে ওয়াজিউল্লাহ মিনিস্টারকে বোঝাচ্ছে ? ডাঃ গিয়াসের পিঠ দিয়ে এই প্রথম শিরশির করে একটা স্রোতধারা বেয়ে গেল। তাহলে সে হেরে গেল ? শেষ খেলাটা খেলতে পারল না। মাইক্রোটা তখন ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাটা মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ঢালু এবং বাজে। হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করল গিয়াস, তাকে খুব সম্ভব চট্টগ্রামের কাছে কোথাও আনা হয়েছে। কারণ গাড়ির বেশ কয়েকজনের ভাষা দুর্বোধ্য। গিয়াসের মনে পড়ল কে যেন মন্তব্য করেছিল চট্টগ্রামের ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কিছু মিল আছে, কথাটা সত্য নয়। কারণ ওদের কথা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথম দিকে যারা কথা বলছিল, তারা কথা বলছে না। তবে কি তারা নেমে গেল ? তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে অন্য গ্রুপের কাছে, এরা তাহলে কারা ?

মলি খুব অবাক হলো বিষয়টায়। ডাঃ গিয়াস হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ? জেলখানা থেকে বলা হয়েছে সে এই জেলে নেই। তাহলে কোন জেলে ? সেটা তারা জানে না বা জানলেও বলতে পারছে না। সে ফোন করল রাজু মামাকে, মামা খবর কিছু পেলে ?

না, এখনো তেমন দেয়ার মতো কিছু পাই নি। তবে বিষয়টা বেশ জটিলরে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা আছে।

সব ঘটনা আমার জানার দরকার নেই। আমি একটা ঘটনাই জানতে চাই, ডাঃ গিয়াস কোথায় ?

আচ্ছা একটা ব্যাপার বল তো তুই কি ওর প্রেমে পড়েছিলি ?

বোধহয়।

এখন প্রেম নেই ?

না।

কেন ?

কারণ যেদিন জানতে পারলাম লোকটা একজন মিনিস্টারকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল ডাক্তার হয়ে ...

কিন্তু মিনিস্টার লোকটা তো মহাবদ ছিল।

তা থাক। ডাক্তারের প্রথম কাজ মানুষকে বাঁচানো।

আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর থেকেই তুই ওকে ঘৃণা করতে শুরু করলি ?

অনেকটা।

তাহলে এখন আবার নাকি কান্না কাঁদছিস কেন ?

দেখ মামা, তুমি দেশের সেরা পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার, তোমার একটা দায়িত্ব নেই ?

না। পত্রিকার দেয়া অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। কাজ নেই।

ঠিক আছে কাজ করতে হবে না। মলি লাইন কেটে দেয়।

গিয়াসকে একটা অন্ধকার ঘরে ছুড়ে ফেলা হলো। অনেকটা দুমড়েমুচড়ে আছড়ে পড়ল সে। খুব ভোরে তার চোখের পট্টি খুলে দেয়া হলো। হাতের বাঁধনও খুলে দেয়া হলো। চোখ খুলে গিয়াস দেখতে পেল, তার সামনে পা ফাঁক করে অস্ত্র হাতে দুজন দাঁড়িয়ে, অনেকটা ইংরেজি ছবির ভিলেনের মতো। হাতের অস্ত্র দুটো খাটো চায়নিজ গানের মতো কিন্তু দেখতে ভয়ঙ্কর ! যে লোকটা তার বাঁধন খুলে দিল সে পরিষ্কার গলায় বলল, বাথরুম টাতরুম সাইরা রেডি হ। স্যার আইসা পড়ব।

কোন স্যার ?

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ্।

এটা কোথায় ?

সেইটা জানা জরুরি না।

অস্ত্র হাতে ধরা একজন এগিয়ে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। গিয়াস উঠে দাঁড়াল। সারা শরীরে ব্যথা। তাকে পাহারা দিয়ে একটা টয়লেটে ঢুকানো হলো। জঘন্য নোংরা টয়লেট, একটা টেপ দিয়ে টিপ টিপ করে পানি পড়ছে। গিয়াস যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন হবার চেষ্টা করল। দেরি হতে দেখে বাইরে থেকে দরজায় জোরে জোরে বাড়ি পড়ল। গিয়াস বেরিয়ে এল। আবার সেই আগের ঘরটায় আনা হলো। এবার সেই ঘরে ছোট্ট একটা টেবিল আর চেয়ার পাতা। টেবিলে একটা প্লেটে একটা তন্দুর রুটি আর ভাজিটাইপের কিছু, আর এক গ্লাস পানি। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল, অনেকটা গোগ্রাসেই খেল রুটিটা। একটাই রুটি ছিল। আরো থাকলে হয়তো তাও খেয়ে ফেলত গিয়াস। অস্ত্রধারী দুজন স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে গিয়াসের দিকে। সাথে সেই লোকটি। কারো মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে দিতেই থুথু করে ফেলে দিল গিয়াস। পেচ্ছাপ। একযোগে হেসে উঠল এবার তিনজন। যেন বিরাট কোনো রসিকতা করা হয়েছে।

পানি খাবা পরে, অনেক পানি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

উঠ। বলে অস্ত্রধারীদের একজন অস্ত্র দিয়ে ঠেলা দিল।

আমাকে এখন কোথায় নেওয়া হচ্ছে ?

সেটা গেলেই দেখতে পাবা।

গিয়াস উঠে দাঁড়ায়। পেচ্ছাবের বিশ্রী স্বাদে মুখটা নষ্ট হয়ে গেছে। গা গুলিয়ে বমি আসছে। ওয়াজিউল্লাহ্ মিনিস্টারের মুখে বমি করতে পারলে ভালো হতো। সেটা মনে হয় এই জীবনে আর সম্ভব হবে না।

গিয়াস যা বুঝল এটা মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর একটা গোপন বাংলো ধরনের কিছু। সুন্দর করে সাজানো। পাহাড়ের উপর বাংলো বাড়ির মতো। মাঝে ছোট একটা জলাশয়। জলাশয়টা চারদিকে পাথর দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো। জলাশয়ের উপরে ডাইভ দেয়ার জন্য একটা জাম্পিং বোর্ড। পানি ঝকঝকে নীল। গিয়াসকে জলাশয়ের পাশের একটা সেড দেয়া সুন্দর জায়গায় চেয়ারে বসানো হলো। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকল দুই অস্ত্রধারী। অবশ্য ইতোমধ্যে গিয়াসের হাতদুটো পেছন দিকে বেঁধে ফেলা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। ঠিক তখনই হুইল চেয়ারে করে ঠেলে আনা হলো যাকে তিনি মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ।

কেমন আছ ডাক্তার ?

আমি ভালো আছি, আপনি তো মনে হচ্ছে খুব বেশি সুবিধায় নেই। হাসিমুখে বলার চেষ্টা করে গিয়াস।

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর মুখেও মিটি মিটি হাসি।

ডাক্তার, নাস্তা করছ ?

জি করছি স্যার।

ডাক্তার, সকালে নাস্তার পরে নাকি পানি দেয় নাই তোমারে ?

না।

ছি ছি পেশাপ দিছে ? কার পেশাপ জানো ?

আর যারই হোক, পেশাপটা কোনো মানুষের ছিল না। গিয়াস হাসিমুখে বলার চেষ্টা করে।

মুহূর্তে মুখের হাসি নিভে যায় এক্স মিনিস্টার এমপি ওয়াজিউল্লাহর।

পানি খাইবা, একটু পরেই খাইবা, যত ইচ্ছা খাইবা ... অবশ্য জুহি যদি তোমারে খাওয়ার সময় দেয়।

গিয়াস বোঝার চেষ্টা করে। তারা আসলে ঠিক কী করতে চাচ্ছে তাকে নিয়ে ? মেরে ফেলবে সে তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু কীভাবে ? পানিতে ডুবিয়ে ? ঐ সুন্দর জলাশয়ে। মাথা ঘুরিয়ে জলাশয়টা দেখার চেষ্টা করে। ঝকঝকে নীল পানি।

ডাক্তার। ঐ যে জলাশয়টা দেখছ তোমার পিছনে ঐখানে ছোট্ট একটা দরজার মতো আছে। ঐ দরজাটা খুলে দিলে জুহি চলে আসে।

জুহি ?

হ্যাঁ জুহি।

জুহিটা কে ?

আমার প্রিয় পেট বলতে পার।

কীরকম পেট ?

জুহি হচ্ছে আমার পালা কুমির। সেই ছোটবেলা থেকে পালছি। এখন পূর্ণবয়স্ক আর ভয়ঙ্কর। সে হচ্ছে 'ক্যা ম্যান কুমির', আফ্রিকার ভয়ঙ্কর কুমির। কুমিরদের মধ্যে এরাই শ্রেষ্ঠ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। এলিগেটর, ঘরিয়াল, ক্যা ম্যান আর ক্রকোডাইল।

স্যার তো মনে হচ্ছে কুমির সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন।

তা রাখি। কুমিরই একমাত্র প্রাণী যে লোহা খেয়ে হজম করতে পারে। তোমাকে হজম করতে সে মনে হয় খুব বেশি সময় নিবে না।

আমি তাহলে আপনার ক্যা ম্যান কুমিরের পেটেই যাচ্ছি ?

ক্যা ম্যান কুমির না, ওর একটা নাম আছে, জুহি। আমার খুব অপছন্দের যারা তারা হয় জুহির খাদ্য। জুহি অবশ্য একটা আস্ত মানুষকে চিবিয়ে খেতে খুব বেশি সময় নেয় না।

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ পাইপ ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। সুন্দর গন্ধ। এরিন মোর নাকি ?

ডাক্তার তুমি তৈরি ?

এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না ? বেশ ...

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ ঘড়ি দেখে। চোখে কিছু ইশারা করে কাউকে। সঙ্গে সঙ্গে কো কো করে একটা শব্দ শোনা যায়, জলের নিচে কিছু একটা খুলছে বা সরছে এ ধরনের শব্দ। তবে কি দরজা খুলে জুহিকে আনা হচ্ছে নীল স্বচ্ছ জলাশয়ে ? পেছনের জলে একটা প্রবল আলোড়ন শুনতে পায় গিয়াস। তার আর পেছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। অস্ত্রধারী দুজন এগিয়ে এসে দড়ি খুলে তাকে দাঁড় করায় চেয়ার থেকে।

তোমাকে ওরা ঐ জাম্পিং পেড থেকে ফেলে দিবে এই সুইমিং পুলে। তারপর... ? মিটি মিটি হাসে ওয়াজিউল্লাহ। তৃপ্তির হাসি। শেষ পর্যন্ত তার জয় হতে যাচ্ছে। পরাজিত প্রতিপক্ষ সামনে দাঁড়িয়ে।

অস্ত্রধারীরা তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে জাম্পিং প্যাডে উঠছে গিয়াস। তাহলে সত্যি সত্যিই সে হেরে গেল ? কুমিরের খাদ্য হতে যাচ্ছে সে। কী বিচিত্র মৃত্যু। জাম্পিং প্যাডের শেষ মাথা পর্যন্ত দু'ধারে রডের রেলিং দেয়া।

তারা হেঁটে এসে শেষ মাথায় দাঁড়াল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী দুজন। অস্ত্র এখন ওদের কাঁধে। তারা দুজন একহাতে ধরে রেখেছে গিয়াসকে, অন্য হাতে জাম্পিং প্যাডের রেলিং। একজন ডান হাতে ধরে রেখেছে গিয়াসকে, একজন বাম হাতে। গিয়াসের দু'হাত পেছন থেকে বাঁধা। গিয়াস দ্রুত চিন্তা করে। শেষ একটা চেষ্টা কি করবে সে ? কিন্তু কীভাবে ? নিচে তাকিয়ে দেখে, নীল স্বচ্ছ জলে কিলবিল করছে একটা বিশাল প্রাণী। ওটাকে কুমির বলা যায় ? ওটা কি সত্যিই কুমির ? আফ্রিকান ক্যা ম্যান কুমির ? এত বিশাল বিভৎস ? এটাই জুহি ? কোথায় পেল ওকে ওয়াজিউল্লাহ ? ভয়ঙ্কর প্রাণীটা চোখের অর্ধেক ভাসিয়ে ভেসে আছে। এটাই তাদের নিয়ম, সে তার চোখের জল-সীমানায় শিকার খুঁজছে।... একটা উপায় আছে, পাশের দুজনকে নিয়ে যদি পানিতে ঝাঁপ দেয়া যায় ? কৌশলে ওদেরকে উপরে রেখে অর্থাৎ ক্যা ম্যানের জল-সীমানায় রেখে ডুবসাঁতার দিতে হবে। পানির গভীরের শিকারে কুমিরা আগ্রহী হয় না। অবশ্য এটা অ্যাবসার্ড চিন্তা। গিয়াস তাকিয়ে দেখে, মিনিস্টার তার হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। হয়তো এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুদৃশ্য তার সহ্য হয় না, হোক না প্রতিপক্ষ। ভেতর থেকে জলের ঝপাং শব্দ শুনেই নিশ্চিত হবেন তিনি যে প্রতিপক্ষের মৃত্যু হয়েছে।

মলির মেজাজটা ভীষণ খারাপ। আজ একটা বাজে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তার। এই সময় এইরকম একটি ঘটনা তার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু ...। মলির ফোনটা বেজে উঠে।

হ্যালো মামা ?

তোর ডাক্তারের খবর কিছু পেয়েছি মনে হচ্ছে।

কী খবর ?

বেঁচে আছে। মানে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

মানে ?

মানে এখন বলা যাবে না। টপ সিক্রেট।

মামা, প্লিজ হেঁয়ালি করো না। একটু খুলে বলো।

একে একে সুতার জট খুলছি... গুটিটা পাকাতে দে।

জট তো সেই কবে থেকেই খুলছো।

ঝানু গোয়েন্দারা তাড়াহুড়ো করে না।

তুমি কি গোয়েন্দা না সাংবাদিক ?

কোনোটাই না। আপাতত 'সাংঘাতিক'...। থাকিস বিকেলে, আমি আসছি। আপাকে বলে খাবার-দাবার রেডি রাখিস।

মলিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মামা ফোন রেখে দেয়।

সন্ধ্যায় মামা যখন আসে, তখন মলিদের বাসার ড্রইংরুমে প্রচুর লোকজন। খাওয়া-দাওয়ার ধুম। এক কোনায় পরীর মতো সেজেগুজে বসে আছে মলি। ক্রাইম রিপোর্টার মকবুল হুদা ভাবল এই সময় ঐ ডাক্তারের এই গল্পটা কি শোনানো যাবে মলিকে, না শোনানো উচিত ? সে নিঃশব্দে বের হয়ে এল। বাইরে সিএনজিটা তখনো চলে যায় নি। আগের প্যাসেঞ্জারকে ফিরে আসতে দেখে মাথা বের করল, স্যার আবার যাইবেন নাকি ?

হ্যাঁ। যাইবা ?

উঠেন কই যাইবেন ?

জাহান্নাম।

সিএনজি ড্রাইভার হাসে। জাহান্নাম যাওয়ার জন্য মিটারটা ফের অন করে। মিটারটায় তিনটা ছয় উঠে পাশাপাশি। মিটার কি এর মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল ? কে জানে!

রহস্যময় কারণে আজ রাস্তা ফাঁকা। তীব্র গতিতে ছুটছে সিএনজি। এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা একটাই, সেই হিসেবে সিএনজি টান দিয়েছে সে। সামনে থেকে ছুটে আসা বেপরোয়া একটা ট্রাককে যেভাবে সে কাটাল তাতে তার সাহসের প্রশংসা করতে হয়, ভাবে মকবুল। মকবুল নিজে কি সাহসী ?

মাঝে মাঝে তার সাহসী হতে ইচ্ছে হয়। সাহসের সাথে অর্থনৈতিক বিষয়টা জড়িত বলেই কি পারে না ? নইলে মলির ডাক্তারের যে ইতিহাস সে বের করেছে তা সত্যিই ভয়াবহ! এটা কি সে লিখতে পারবে ? কখনোই না। তার দোষ কী ? পৃথিবীর ইতিহাসই কি সঠিক ? রক্তাক্ত ধারালো তলোয়ার দিয়ে লেখা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস... কখনোই কলমে নয়। পৃথিবীর জ্ঞানীরা তো তাই বলেন। মকবুল চেঁচিয়ে উঠে, এই এখানেই রাখ।

ক্যান সার! আপনার জাহান্নাম কি আয়া পড়ল ?

ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে মকবুল। এখানে কাছেপিঠে একটা দোকানে চমৎকার চা বানায়। গরুর দুধের চা। মাঝে মাঝে মকবুল খায়। সিগারেট ধরিয়ে চায়ের দোকান খুঁজতে থাকে মকবুল।

গিয়াস দ্রুত চিন্তা করে। শেষ একটা চেষ্টা কি করবে সে ? কিন্তু কীভাবে ? অস্ত্রধারী দুজন একজন তাকে ধরেছে ডান হাতে একজন বাম হাতে। বাম হাত আর ডান হাত, ডান হাত আর বাম হাত। দুজন মানুষের দুটো আলাদা হাত একসঙ্গে ধাক্কা দিবে তাকে ? তারা কি একসঙ্গে ধাক্কা দিতে পারবে তাকে। তাদের দুজনের মস্তিষ্ক কি একসঙ্গে কাজ করবে ? গিয়াসের মনে পড়ল জেলের সেই ম্যাজিশিয়ানকে। সে বলেছিল, স্যার আপনের নিজের ডান হাত আর বাম হাত আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু ধরেন গিয়া যদি আলাদা দুইটা হাত হয় ? তারপর লোকটা অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছিল... গিয়াসের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলে। মাথার ভেতরের শত কোটি নিওরন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তারা একযোগে দুটো আলাদা কাজ করে... ম্যাজিশিয়ানের মাথাটা হঠাৎ যেন গিয়াসের মাথায় ঢুকে যায়...।

স্যার চিন্তাটাকে দুই ভাগ করুন।

করলাম।

ডান হাতের জন্য এক চিন্তা বাম হাতের জন্য আরেক চিন্তা...।

করলাম।

আঙুলগুলো ভাঁজ করে আনুন।

করলাম।

খুলুন ... বৃহস্পতিবার ও শুক্রের আঙুল বন্ধ থাকবে।

করলাম

ধাক্কা ... দিন...

ঝপাং করে একটা শব্দ উঠে সুইমিংপুলে। তারপর একটা ভয়ঙ্কর আর্ত চিৎকার। জলের আলোড়ন। একটার পর একটা পরিচিত শব্দ এসে যেন মধু ঢালে মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর কানে। ঠিক তখনই কিংবা একটু পরেও হতে পারে। দ্বিতীয় একটি ঝপাং শব্দ এবং আর্ত চিৎকার এবং দ্বিতীয়বার আলোড়ন। ভ্রু কুঁচকে যায় মিনিস্টারের। কী হলো ? দুটো শব্দ কেন ? শব্দ তো হওয়ার কথা একটা! হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরে চলে আসেন তিনি। এ-কী ডাক্তার গিয়াস সেই চেয়ারটায় বসে আছে। একটু আগেও যেভাবে বসে ছিল সেভাবে। পার্থক্য হচ্ছে, এবার তার হাত বাঁধা নেই, খোলা। হাঁটুর উপর একটা চায়নিজ রাইফেল খুব অবহেলায় ফেলে রাখা। রাইফেলটা নিশ্চয়ই বডিগার্ড দুজনের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু কীভাবে ? লোকটা কি জাদু জানে ? পেছনের নীল পানিটা লাল হয়ে উঠেছে, জুহিকে দেখা যাচ্ছে না। মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর চোয়াল ঝুলে পড়ে।

স্যার, মনে হচ্ছে দাবার ছক আবার উল্টে গেল। কী বলেন ?

ওয়াজিউল্লাহ কথা বলতে পারেন না। এত হতভম্ব তিনি কখনো হন নি আগে। এটা কী করে সম্ভব ? তার মানে অস্ত্রধারী দুজন জুহির খাদ্য হয়েছে, আর গিয়াস একা ...

স্যার, ঠিক করেছি আপনাকে আমি মারব না। তবে একটা গল্প বলব।

গল্প ?

হ্যাঁ ছোট্ট একটা গল্প। আসলে কি স্যার জানেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে আমি বোধহয় একটু চেঞ্জ হয়ে গেছি।

ওয়াজিউল্লাহ কথা বলেন না। ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকেন।

গিয়াস আবার শুরু করে, স্যার, যে গল্পটা বলব সেটা সত্যি গল্প। আগেও বলেছিলাম। তখন ইচ্ছে করেই একটু মিথ্যা বলেছিলাম। এখন সত্যি গল্পটা বলব। স্যার মনে আছে ? সেই যে সুরমা বেগমের কথা বলেছিলাম, যাকে এক রাতে আপনি নষ্ট করেছিলেন। আমার মা। যিনি ঐ রাতেই আত্মহত্যা করেছিলেন। আসলে কি জানেন স্যার, আমি একটু মিথ্যা কথা বলেছিলাম। উনি ঐ রাতেই আত্মহত্যা করেন নি। আত্মহত্যা করেছিলেন ঠিক একবছর পর। মানে আমার জন্মের পর।

মানে তু— তুমি কী বলতে চাচ্ছ ?

আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি হচ্ছেন আমার সেই লম্পট বাবা।

মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহর চোয়াল ঝুলে পড়ে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন স্থির চোখে গিয়াসের দিকে। তির তির করে কাঁপে তার ঝুলে পড়া নিচের ঠোঁটটা। ভীষণ কুৎসিত দেখায় তাকে।

বাবা, তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। গিয়াস হঠাৎ নাটকীয়ভাবে গলা নামিয়ে বলে, এক. তোমার লোকজনকে দিয়ে আমাকে শহরে পৌঁছে দিতে হবে এখনই। এটা খুব সম্ভব কক্সবাজারের ধারে কাছে কোনো এলাকা হবে তাই না ? দুই. তোমার জুহি মনে হচ্ছে এখনো ক্ষুধার্ত। তুমি নিজেই কি হুইল চেয়ার চালিয়ে তোমার সুইমিং পুলে নেমে যেতে পারবে না ? আমার মনে হয় পারবে। কী বলো ? আর আরেকটা কথা, বাবা ডাকলাম কেন ? আসলে অন্তত একবার হলেও ডেকে দেখলাম কেমন লাগে, হোক না লম্পট বাবা, বাবা তো!

গিয়াসকে নিয়ে যখন ফোরহুইল সিক্সসিলিন্ডারের ফোর্ড জিপটা ছুটছিল রামুর প্যাঁচানো রাস্তা ধরে কক্সবাজারের দিকে, তখন এক্স মিনিস্টার এমপি ওয়াজিউল্লাহ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হুইল চেয়ারে করে তার নিজের তৈরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জুহির দিকে। নীল পানিটা অনেক আগেই ঘোলাটে লাল হয়ে উঠেছিল। আরেকটু লাল হবে হয়তো। কুৎসিত প্রাণীটার খাঁজকাটা পিঠ দেখা যাচ্ছে। তার চেয়েও কুৎসিত লাগে নিজেকে। তিনি হুইলের চাকা ঘুরিয়ে চলে এলেন সুইমিং পুলের পাথরে বাঁধানো ঢালে। ঢাল বেয়ে আস্তে আস্তে নামছে তার হুইল চেয়ার। চাকাটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছেন এখানো, মুঠো খুললেই মৃত্যু। একসময় মুঠো খুললেই অনেকের ভাগ্য বদলে যেত। তার পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে তিনি অনেক কোটিপতি তৈরি করেছেন নিজের স্বার্থেই... আর এখন মুঠো খুললেই হিমশীতল মৃত্যু। তিনি মুঠো খুললেন। দ্রুত এগিয়ে গেল তার হুইল চেয়ার সুইমিং পুলের নীল জলের দিকে। জলটা অবশ্য তখন আর নীল ছিল না। তৃতীয়বারের মতো একটা আলোড়ন উঠে সুইমিং পুলের অস্থির জলে। এক্স মিনিস্টার ওয়াজিউল্লাহ শেষবারের মতো একটা আর্তনাদ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। কুমিরটা তার শক্ত চোয়াল দিয়ে গলার কাছটায় কামড়ে ধরেছে। জীবন এত বিভৎস! কুৎসিত!

ডাঃ গিয়াস পকেট হাতড়ে ফোন নাম্বারটা বের করে। আজকাল মোবাইলের এই যুগে টেলিফোন বুথ থাকার কথা না। কিন্তু কক্সবাজারের এই হোটেলটাতে আছে। কী মনে হলো তার, ঐ বিশেষ নাম্বারটায় বুথ থেকে ফোন দিল।

হ্যালো!

মিষ্টি পরিচিত গলা একটা।

কে বলছেন ?

আমি ডাঃ গিয়াস।

ওপাশে নীরবতা। গিয়াসই আবার বলে, কিছু বলছ না যে ? তোমার মামার কাছে আমার সব স্টেটমেন্ট আছে...

আমি জানি।

পড়েছিলে ?

ওপাশে কোনো উত্তর নেই।

হ্যালো ?

বলুন।

তোমার ... তোমার কিছু বলার নেই ? তুমি কোথায় ?

ওপাশে যেন কবরের নিস্তব্ধতা।

হ্যালো ? গিয়াস ফের চেঁচায়।

স্যার...

হ্যাঁ, বলো শুনছি।

স্যার, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি...

আমি ?

আমি গুলশানে আমার হাজব্যান্ডের বাসায়। কান্নাভেজা গলায় বলে মলি। অন্তত গিয়াসের তাই মনে হয়।

ও আচ্ছা। ফোন রেখে দেয় গিয়াস।

হঠাৎ করে অবসাদ এসে ভর করে তাকে। হোটেল থেকে বের হয়ে হাঁটতে থাকে। বালির উপর দিয়ে। এই হোটেলটাই বোধহয় সমুদ্রের সবচে' কাছে। কী নাম ? সী ক্রাউন! জোয়ার শেষ হয়ে ভাটার টান শুরু হয়েছে। তারপরও সমুদ্র আছড়ে পড়ছে প্রবল বিক্রমে। হাঁটু পানিতে এসে দাঁড়ায় ডাঃ গিয়াস। জীবনটাকে নতুন করে শুরু করা যেত কি ? নিজেকেই প্রশ্ন করে গিয়াস। যেত হয়তো। কিন্তু ... পায়ের নিচ থেকে বালি সরে যাচ্ছে ... ভাটার টান প্রবল ... সমুদ্র কি এভাবেই ডাকে ? জীবনকে মৃত্যুর দিকে ? গিয়াস দাঁড়িয়ে থাকে।

হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে লবণাক্ত ঘোলা জল। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সাদা ফেনাটুকু শুধু জানান দেয়... এটা সমুদ্র, পিছুহটা সমুদ্র... পিছুহটা সমুদ্র ডাকে... কাউকে গভীরভাবে কাউকে ডাকে!

দেখ দেখ, ঐখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল না। ঐ লোকটা ওখানে আর নেই। লোকটা কি ডুবে গেল ?

কই ? আমি তো কাউকে দেখি নি।

কী জানি, আমার ভুলও হতে পারে। চল ফেরা যাক। বলে সেলিনা তার ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেলিনার মনে হলো, তার ভুল হওয়ার কথা নয়। সে স্পষ্ট দেখেছে একটা লোক হেঁটে হেঁটে গিয়ে ওখানটায় দাঁড়াল। পেছন থেকে লোকটাকে আজমলের মতো লাগছিল। এজন্যই আরো মনে আছে। কে জানে আজমলরা হয়তো এমনি করেই হারিয়ে যায়! সেলিনার দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রের লোনা বাতাসে মিশে যায় নিঃশব্দে।

—